নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ২১

ডিসেম্বর ২০১০

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১০

প্রকাশক : ব্র্যাক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২

সহযোগী সম্পাদক : আলতামাস পাশা

প্রচ্ছদ : সাজেদুর রহমান

অক্ষর বিন্যাস
ও অঙ্গসজ্জা : মো. আকরাম হোসেন

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৮৭-৮৮ (পুরাতন) ৪১ (নতুন) ব্লক-সি
টঙ্গী শিল্প এলাকা, গাজীপুর ১৭১০

নির্যাসের এ সংখ্যাটিতে ব্র্যাক আফ্রিকা কার্যক্রমের ওপর একটি প্রতিবেদনসহ ২০০৭ সালের ১টি ও ২০০৮ সালের ২টি, ২০০৯ সালের ৪টি এবং ২০১০ সালের ১টি বাছাইকৃত গবেষণা রিপোর্ট স্থান পেয়েছে। এছাড়া মায়ের গর্ভকালীন বিষণ্নতা নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন এবং সাম্প্রতিক খবর প্রকাশ করা হল।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষক বা লেখকগণের একান্ত নিজস্ব।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক : হাসান শরীফ আহমেদ
সদস্য : শফিকুল ইসলাম, বাবর কবির, আন্না মিন্‌জ,
ইশতিয়াক মহিউদ্দীন ও কাওসার আফসানা

Nirjash: Summary of selected BRAC research reports of 2007, 2008, 2009 & 2010, two special report, and one report on recent RED activities. Number 21, December 2010. Published by BRAC Research and Evaluation Division, 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়: দারিদ্র্য ও আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস **১**

সাম্প্রতিক খবর **৬**

মায়ের গর্ভকালীন বিষণ্নতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের
শিশু জন্মের জন্য দায়ী **৯**

মাধ্যমিক শিক্ষা: মান ও সমতাসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ **১৩**

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন: ব্র্যাক সামাজিক কর্মসূচি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের
ভিত্তিতে গবেষণামূলক অনুসন্ধান **২০**

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরিচ্যুত কর্মীদের জন্য ব্র্যাকের সামাজিক
নিরাপত্তা প্যাকেজ: একটি সার্বিক মূল্যায়ন **২৫**

অতিদরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন এবং
স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) কর্মসূচির একটি মূল্যায়ন **৩২**

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর সম্পদ হস্তান্তরের প্রভাব **৩৬**

ব্র্যাক উগান্ডা গবেষণা ইউনিটের বিকাশ ও বিভিন্ন কার্যক্রম **৩৯**

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা উপজেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব **৪২**

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কেন্দ্রগুলোতে সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে
অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্যতা ও যথোপযুক্ত ব্যবহার:
বাংলাদেশ কেমন করছে? **৪৫**

দাঁত ও মুখের যত্ন সম্পর্কে পল্লী এলাকার জনগণের ধারণা:
একটি পাইলট জরিপ **৫০**

শোক সংবাদ

আমরা শোকাভিভূত

ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা ব্র্যাকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক মো: আমিনুল আলমের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর প্রতি আমাদের অন্তিম অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

মরহুম আমিনুল আলম ১৯৭৫ সালে ব্র্যাকে যোগদান করেন এবং ব্র্যাকের কর্মসূচিসমূহের অন্যতম স্থপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ব্র্যাকের সমস্ত কর্মকাণ্ডে রয়েছে তাঁর কর্মপ্রয়াসের অম্লান স্বাক্ষর। বাংলাদেশের প্রতিটি কোণে এবং পরবর্তী সময়ে এশিয়া-আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের দশটি দেশে তাঁরই নেতৃত্বে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটে। তাঁর কর্মপ্রয়াসে কর্মকাণ্ডের আকার ও ব্যাপ্তিতে ব্র্যাক আন্তর্জাতিক কর্মসূচি অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মরহুম আমিনুল আলম নির্যাসের শুরু থেকেই এর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাদের চলার পথকে আলোকিত করেছেন।

গরীব মানুষের সেবায় তাঁর সীমাহীন উদ্যোগ ও নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদন শুধু ব্র্যাকের ভিতরেই নয়, উন্নয়ন জগতেও বিপুল প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করেছে। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা গভীরভাবে আলোড়িত করেছে তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও গরীব মানুষকে, যাদের জীবনকে তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিলেন।

পরম করুণাময়ের কাছে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি এবং তাঁর স্বজনদের এই শোকভার সহ্য করবার শক্তিদানের জন্য প্রার্থনা করছি।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:১-৫

সম্পাদকীয়

দারিদ্র্য ও আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস

দারিদ্র্য হচ্ছে এমনই একটি অর্থনৈতিক অবস্থা যেখানে একজন মানুষ তার জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে পারে না। চোখে দেখা যায় দারিদ্র্যের এমন অবস্থাগুলো হচ্ছে অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, জীর্ণশীর্ণ বাসস্থান, শিক্ষার অভাব এবং বেকারত্ব বা কোন কাজ না থাকা রুগ্ন দুর্বল মানুষ। সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাচারিতা ও আগ্রাসন, জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঘন ঘন বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও দারিদ্র্য অবস্থা তৈরি করতে পারে।

দারিদ্র্য দূর করতে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা চলছে। বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূর করে একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য সমবেত আন্দোলন ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কারণ এই দারিদ্র্যের কারণে বিশ্বে এক কোটিরও বেশি মানুষ দিনে এক ডলারেরও কম আয় করে থাকে। প্রতিবছর এগারো লক্ষ শিশু মারা যায় যাদের বয়স পাঁচ বছরের নীচে। এছাড়া ছয় লক্ষ্যেরও বেশি শিশু মারা যায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযোগ্য ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া এবং নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে।

এধরনের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস। দিবসটি উদযাপনে এবছরের প্রতিবাদ্য বিষয় ছিল, 'From poverty to decent work: bridging the gap'। এই দিনটি পালনের মাধ্যমে সুযোগ হয় দরিদ্র মানুষের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণার। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গরীব মানুষকে সামনের কাতারে থাকতে হবে। গরীব মানুষকে কথা বলার জন্য এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পদক্ষেপ গ্রহণে দরিদ্রদের সোচ্চার হতে অনুপ্রাণিত করা হয় এই দিবস উদযাপনের মাধ্যমে।

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবসটি প্রথম উদযাপিত হয় ১৯৮৭ সালের ১৭ অক্টোবর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের Trocadero নামক স্থানে। এখানে অনুষ্ঠিত বিশাল এক সমাবেশে চরম দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও ক্ষুধার শিকার মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সংহতি জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই স্থানটিতেই ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্যারিসের এ সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, দারিদ্র্য হচ্ছে মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন। এই সমাবেশ থেকে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় দারিদ্র্য নিরসন করে সমবেতভাবে মানবাধিকার নিশ্চিত করার। অবশেষে জাতিসংঘও ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর দিবসটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পক্ষ থেকে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে দিবসটি যথাযথ জাতীয় গুরুত্ব দিয়ে পালনের আহবান জানানো হয়। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যাবলীকে হতে হবে বাস্তবসম্মত যাতে দরিদ্রতা ও চরম অভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করা যায়। জাতিসংঘের এ প্রস্তাবনায় সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহকে এবং এনজিওগুলোকে দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সহায়তার আহবান জানানো হয়। আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস পালনের মাধ্যমে জাতীয়স্তরে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিও আহবান জানানো হয় জাতিসংঘের বিদ্যমান সম্পদের ওপর ভিত্তি করে দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপন নিশ্চিত করার জন্য।

দারিদ্র্য নিরসনের প্রথম দশকটির সময়সীমা ছিল ১৯৯৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। এসময়টিতে জাতিসংঘ কর্তৃক মিলেনিয়াম উন্নয়ন ঘোষণাপত্র ঘোষিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন-২০০৫। এসব বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র্য নিরসনে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে দারিদ্র্য হ্রাসে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে দারিদ্র্য নিরসনে জাতিসংঘ ঘোষিত দ্বিতীয় দশকের (২০০৮-২০১৭) ঘোষণা দেয়। এ দশকের মূলবিষয়বস্তু হচ্ছে, 'সবার জন্য পূর্ণকালীন এবং উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান' (Full employment and decent work for all) এই মূলবিষয়বস্তু গ্রহণ করার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য যেসব অবশ্যপালনীয় শর্তসমূহ পূরণ করা প্রয়োজন বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে, সেগুলোর ওপরও গুরুত্বারোপ

করা হয়েছে। সামাজিক উন্নয়নের ওপর বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের চব্বিশতম বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাবনাসমূহও এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হয়। দারিদ্র্য নিরসনের দ্বিতীয় দশককে অধিকতর ফলপ্রদ ও সমন্বিত করতে আন্তরিক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস ২০১০ উদযাপনে ব্র্যাক

ব্র্যাকের অ্যাডভোকেসি ইউনিট বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস ২০১০ উদযাপন করে। ব্র্যাকের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় দরিদ্রদের জন্য এমন একটি উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে যেখানে তারা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্জন করতে পারবে অর্থনৈতিক সক্ষমতা। অতিদরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক পুনঃএকীকরণের ওপর প্রাধান্য দিয়ে ব্র্যাক অ্যাডভোকেসি ইউনিট দিবসটি উদযাপনে গৃহীত শ্লোগান, 'জাতীয় ঐক্য রুখবে দারিদ্র্য' - এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। কারণ ব্র্যাক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দারিদ্র্য নিরসনে সরকারি-বেসরকারি যৌথ ও মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য। অতিদরিদ্র্যদের ওপর আলোকপাত করে দিবসটি জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়েও উদযাপিত হয়। জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলায় টক শো'র আয়োজন, যার শিরোনাম ছিল, 'উন্নয়ন ক্ষেত্রে অতি দারিদ্র্য: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমূহ'। জাতীয় দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল, 'অতিদারিদ্র্য হ্রাস:চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনাসমূহ। এছাড়া দেশের ৩৩টি জেলা ও ৪৪টি উপজেলায় অতিদরিদ্র কর্মসূচিভূক্ত এলাকায় র‍্যালি, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হয়। বিলবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ঢাকা শহরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ডে দু'সপ্তাহ ধরে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস ২০১০ উদযাপনে ব্র্যাকের নারী সদস্য, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিক্ষিকা, স্বাস্থ্যসেবিকা, আইন সেবিকা ও পল্লী সমাজ সদস্যদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এসব বক্তব্যে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, 'আমরা ব্র্যাকের ৮০ লাখ নারী সদস্য, ২.৫ লাখ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১৩ লাখ ছাত্রছাত্রী, ৪৪ হাজার শিক্ষিকা, ৮০ হাজার আইনসেবিকা ও ২৫ হাজার পল্লী সমাজ সদস্য দারিদ্র্য নিরসন করে নিজেদের সম্ভাবনা বিকাশে নিবেদিত থাকবো। এছাড়া

জাতীয় দৈনিকগুলোতে এ দিবস উদযাপন উপলক্ষে পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

দারিদ্র্য নিরসনে ব্র্যাক

দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৭৩ সালের দিকে দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচি চালু করে। তারপর থেকে বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্য চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলার পথে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ব্র্যাক নিজেকে পথপ্রদর্শক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে ব্র্যাকের অসাধারণ ও বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সংগঠন হিসেবে সংস্থাটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে যা দারিদ্র্য নিরসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে ব্র্যাক দক্ষিণ গোলার্ধের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করছে এশিয়ার ৩টি দেশ আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় এবং আফ্রিকার ৫টি দেশ লাইবেরীয়া, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ সুদান, তাঞ্জানিয়া ও উগান্ডায়। এছাড়া ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হাইতিতেও ব্র্যাক কাজ করছে। বাংলাদেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্র্যাকের কর্মসূচিভুক্ত দেশগুলোতে ব্র্যাক দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, যাদের বেশির ভাগই নারী - তাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা দিয়ে যেমন দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করছে, তেমনি নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আবার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি অংশের অবস্থা এমনই যে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। কারণ প্রশিক্ষণ, কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাস ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে তারা ঋণ নিয়ে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। এই জনগোষ্ঠীর জন্য ব্র্যাকের অতি দরিদ্র কর্মসূচি ২০০২ সালে শুরু হয়। এই কর্মসূচি চরম দারিদ্র্যের সব দিকই মোকাবিলা করছে। সম্পদ হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ, জীবিকা নির্ধারণ, বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক উন্নয়ন, অধিকার আদায়ে সহায়তা এবং পরিশেষে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দরিদ্রদের জীবনযাপন পদ্ধতিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। এই কর্মসূচির প্রধান দু'টি লক্ষ্য

হচ্ছে; বিশেষভাবে নির্বাচিত অতি দরিদ্রদের জন্য অনুদান প্রদান এবং অন্যান্য নির্বাচিত অতি দরিদ্রদের জন্য অনুদানসহ ঋণ প্রদান। এই কর্মসূচি ২০০৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৪০টি জেলায় বিস্তার লাভ করে। এর মধ্যে এমন ২০টি জেলা রয়েছে, যেখানে চরম দরিদ্রদের সংখ্যা বেশি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৮ লাখ ৬৩ হাজার অতি দরিদ্র পরিবার এই কর্মসূচির আওতায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। অতি দরিদ্র অবস্থা নিরসনে অন্যতম সফল উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদ্যোগ হিসেবে কর্মসূচিটি ইতিমধ্যেই বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশেই পাঁচটি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের এই মডেল হুবহু অনুকরণ করছে। এছাড়া হাইতি, ভারত, পাকিস্তান এবং ইয়েমেনে এই কর্মসূচি হুবহু অনুকরণে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই বদলে দিয়েছে ৩০ বছর আগে দেখা পল্লী-গ্রামগুলোকে। বিগত কয়েক বছরে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে খুব একটা বিরূপ প্রভাব ফেলে নি। যার অন্যতম একটি বড় কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার। এখন পল্লী অঞ্চলে সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার। কর্মসংস্থান হচ্ছে দরিদ্র তরুণ-তরুণীদের। সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হচ্ছে এসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রায় সবাই নারী। ফলে পল্লী সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন ঘটছে তেমনি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেয়েরাও আজ পুরুষের পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে। বাংলাদেশের গ্রামেও জেন্ডার সমতা বিরাজ করছে, যা সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পথিকৃৎ হয়ে থাকতে পারে।

আমাদের সবার স্বপ্ন ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। দারিদ্র্য নিরসনে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে পারলে সে স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে নিঃসন্দেহে।

আলতামাস পাশা
হাসান শরীফ আহমেদ

© BRAC নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:৬-৮

সাম্প্রতিক খবর

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'ব্র্যাক ডে' উদযাপিত

গত ৫ থেকে ৭ আগস্ট, ২০১০ তারিখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাভার ক্যাম্পাসে 'ব্র্যাক ডে' উদযাপিত হয়েছে। মূলত ব্র্যাকের কার্যক্রম ও রূপকল্প সম্পর্কে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করতেই এই 'ব্র্যাক ডে'-এর আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাকের রূপকল্প সম্পর্কে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করা। যেখানে বলা হয়েছে, ব্র্যাক এমন একটি পৃথিবী গড়তে চায় যেখানে কোনপ্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে। আর এরই আলোকে কর্ম পরিচালনা করে ব্র্যাক আজ দক্ষিণ গোলার্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে। ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচি বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার ১১ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে।

এই অনুষ্ঠানে ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ তাদের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত ওয়ার্কিং পেপার, মনোগ্রাফ, নির্যাস এবং অন্যান্য প্রকাশনা প্রদর্শন করে। এসব প্রকাশনা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। গবেষণা ও

মূল্যায়ন বিভাগের নলেজ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ১১৮টি বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক পুস্তক প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের বিভিন্ন প্রকাশনা সম্পর্কে তাঁদের ব্যাপক আগ্রহ ব্যক্ত করে। ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা নির্যাস-এর প্রতি বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ গবেষণা বিভাগের বিভিন্ন প্রকাশনা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ ব্যক্ত করে এ বিভাগের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। 'ব্র্যাক ডে' অনুষ্ঠনে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের স্টল পরিদর্শনে আসেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মাহবুব হোসেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ল্যাংগুয়েজ-এর পরিচালক (লেডি) সৈয়দা সারাওয়াৎ আবেদ, ব্র্যাক ট্রেনিং ডিভিশনের পরিচালক জনাব সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিচালক জনাব ফারুক আহমদ এবং শিক্ষাকর্মসূচির পরিচালক জনাব শফিকুল ইসলাম।

পল্লী সহায়ক ফাউন্ডেশনের বিশ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত উন্নয়ন - মেলা ২০১০

বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লী সহায়ক ফাউন্ডেশনের বিশ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৬ থেকে ৯ নভেম্বর চারদিনব্যাপী এক মেলার আয়োজন করা হয়। পল্লী সহায়ক ফাউন্ডেশন আয়োজিত এ মেলায় ১৩০টি বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী মেলার স্টলগুলোতে স্থান পায়। এসব সামগ্রীর মধ্যে ছিল তাঁতের শাড়ি, ফতুয়া, কামিজ থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর বিভিন্ন রকম সামগ্রী। আর ছিল বিভিন্ন ধরনের কারুপণ্যের সমাহার। পল্লী সহায়ক ফাউন্ডেশন আয়োজিত এ মেলায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সাতটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মেলায় দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক তার বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রম তুলে ধরে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, অতিদরিদ্র কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি, মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি, দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তন কর্মসূচি, ব্র্যাক এডভোকেসি, ওয়াশ এবং কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি। দেশে ও বিদেশে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রম বিভিন্ন ভিডিও শো'র মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়। এই স্টলে আরও স্থান পায় ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম কর্তৃক প্রকাশিত বই, পুস্তিকা ও বার্ষিক প্রতিবেদন। ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রকাশনা ও নির্যাস প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য উক্ত স্থলে রাখা হয়। মেলায় আসা দর্শনার্থীদের এ স্টল বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:৯-১২

মায়ের গর্ভকালীন বিষণ্নতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শিশু জন্মের জন্য দায়ী

- সম্প্রতি একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, সন্তানসম্ভবা মায়েরা যদি গর্ভকালীন সময়ে বিষণ্নতা বা উৎকণ্ঠায় ভোগেন তা'হলে তাদের কম ওজনের শিশু জন্ম দেবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এসব নবজাতকের মৃত্যুর হারও বেশি।

এতোদিন পর্যন্ত কম ওজনের শিশু জন্মের কারণ হিসেবে দায়ী করা হত মায়ের জীবনধারণ পদ্ধতি, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং অপুষ্টিকে। কিন্তু সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সন্তানসম্ভবা মায়েরা যদি গর্ভকালীন সময়ে বিষণ্নতা বা উৎকণ্ঠায় ভোগেন তাহলে তাদের কম ওজনের শিশু জন্ম দেবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এসব নবজাতকের মৃত্যুর হারও বেশি হয়ে থাকে।

সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এ গবেষণার ফলাফল বিএমসি পাবলিক হেলথ জার্ণালে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ গবেষণার প্রধান গবেষক ছিলেন ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের ডা. হাসিমা-ই-নাসরিন।

গর্ভধারণের ২৮-৪২ সপ্তাহের মধ্যে রয়েছেন এমন ৭২০ জন মহিলার মানসিক স্বাস্থ্য এ গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার দুটি উপজেলা থেকে এসব মায়েদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুর জন্মের ৬-৮ মাস পর্যন্ত এ পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকে। মায়েদের প্রজনন ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক তথ্যের পাশাপাশি তাদের জন্ম, মৃত্যু, রোগ ইত্যাদির উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। জন্মের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ৮১% শিশুর জন্মকালীন ওজন পরিমাপ করা হয়। বাংলাদেশের দুটি পল্লী এলাকায় এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, ১৯% মহিলা কম ওজনের বাচ্চার জন্ম দেয়, যাদের ওজন ২,৫০০ গ্রাম-এর নীচে। মায়েদের ১৮% বিষণ্নতার

লক্ষণে ভোগে এবং ২৬% সাধারণ উৎকণ্ঠায় ভোগে। আর এসব মায়েদের খুব কম ওজনের শিশু জন্ম দেবার প্রবণতা বেশি থাকে।

শিশুর অকাল মৃত্যুর কারণের সাথে তার কম জন্মকালীন ওজনের বিষয়টি জড়িত থাকা একটি উদ্বেগজনক সমস্যা নিঃসন্দেহে। এটি পরবর্তী সময়ে মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও শিশুর অপরিপুষ্ট অবস্থার নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায়। গবেষণা থেকে আরও জানা যায় যে, মানসিকভাবে সুস্থ মায়েদের তুলনায় বিষণ্নতা ও উৎকণ্ঠায় ভোগে এরকম মায়েদের কম ওজনের শিশু জন্মদানের হার প্রায় দ্বিগুণ। গবেষকগণ মনে করেন যে, শিশু মৃত্যু ও শিশুর দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য গর্ভকালীন বিষণ্নতা ও উৎকণ্ঠা প্রধান ভূমিকা রাখে এবং এ অবস্থা মায়েদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দারিদ্র্যতা ও অপুষ্টির প্রভাবকেও অতিক্রম করে।

বিষণ্নতা যেমন দরিদ্র মহিলার ওপর প্রভাব ফেলে, তেমনি উচ্চ আর্থ-সামাজিক অবস্থানে রয়েছেন এমন মহিলাদের ক্ষেত্রেও বিষণ্নতার এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়

গবেষকরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন যে, প্রসবপূর্ব বিষণ্নতা সন্তানের কম ওজনের জন্য দায়ী কী না। বিষণ্নতার কোনো শারীরিক প্রভাব রয়েছে কী না সে বিষয়েও তারা নিশ্চিত নন। সম্ভবত এই গবেষণার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে এই যে, দরিদ্র মহিলার ক্ষেত্রে বিষণ্নতা যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনি যেসব মহিলা উচ্চ আর্থ-সামাজিক অবস্থানে রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও বিষণ্নতার প্রভাব রয়েছে। তাই ভ্রূণের বা নবজাতকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে অপুষ্টি এবং অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে বিষণ্নতাও প্রভাব ফেলে বলে মনে করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উন্নত বিশ্বের অন্যান্য স্থানে একই ধরনের গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। তবে বিষণ্নতা ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক উপাদানসমূহের অবদান অজানা থাকায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষণ্নতা এবং গর্ভকালীন স্বাস্থ্য অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণাটি গবেষকদের জন্য ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কম ওজনের ছোটখাট নবজাতকরা মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে এবং দেখতে একটু বেশি ওজনের বড় নবজাতকের তুলনায় এদের মারা যাবার সম্ভবনা বা হারও বেশি থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এটি অস্পষ্টই থেকে যায় কেন কতিপয় গবেষণায় বিষণ্নতা বা

উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভ্রূণ বিকাশের জোরালো সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না, যেমনটি বর্তমান গবেষণায় দাবি করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এই উদাহরণটি সন্দেহাতীতভাবে মিশ্র অবস্থায় রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে আমাদের বিদ্যমান জ্ঞান সীমিত হবার কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রসব হয়ে যাওয়া বা শিশুর জন্মকালীন ওজন কম হওয়া কতখানি সম্পর্কযুক্ত তা বলা কঠিন। বিভিন্ন গবেষকের মতে এক্ষেত্রে হাতে গোণা সামান্য কিছু সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে যা মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলায় তা নবজাতকের জন্মকালীন ওজনের ওপরও প্রভাব ফেলে। বিষণ্ন মায়েরা গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে তেমন সচেষ্ট নাও থাকতে পারে। এসব মায়েরা যথেষ্ট ওজন লাভে সক্ষম নাও হতে পারে। বিষণ্নতা ও উৎকণ্ঠার সাথে যুক্ত নিউরোএন্ডোক্রাইন প্রভাব কোন না কোন ভাবে স্বাভাবিক ভ্রূণ বিকাশ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

বর্তমান গবেষণাটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে মায়েদের রুগ্ন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিষণ্নতা ও উৎকণ্ঠার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়ক হবে। শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য ৪-এ শিশু মৃত্যু হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ৫-এ বলা হয়েছে ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ করতে হবে। তাই জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আমাদের কম ওজনের শিশু জন্মের হার কমিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় মায়েদের বিষণ্নতা ও উৎকণ্ঠা চিহ্নিত করা ও তার প্রতিকারে যথাযথ সহায়তা ও সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

-বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন- আলতামাস পাশা।

তথ্য সূত্রঃ

১. Depressed mothers birth low birth weight babies? http://www.trying-to-conceive.com/news/depressed-mothers-birth-low-birth-weight-babies. (accessed on 2 September 2010)

২. Depression link to low birth weight. Press Association, 25 August, 2010.

৩. Maternal depression predicts low birth weight. The behavioral medicine report. Mental health, 27 August, 2010.

৪. Mental state affects birth weight. UNBconnect, 27 August, 2010.

৫. Sad mothers give birth to smaller babies, study finds, TIME magazine, 25 August, 2010.

৬. Sad mothers give birth to underweight babies, research suggests. Aol health, 26 August, 2010.

৭. Sad mothers have small babies. Innovations-report, 26.08.2010, http://www.innovations-report.com/html/reports/studies/sad_mothers_small_babies_160399.html. (accessed on 2 September 2010)

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:১৩-১৯

মাধ্যমিক শিক্ষা: মান ও সমতাসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ*

সমীর রঞ্জন নাথ, মুহাম্মদ নাজমুল হক, উম্মে সালমা বেগম, এএমএম আহসান উল্লাহ্, মো. আব্দুস সাত্তার ও আহমেদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

- ব্যবস্থাপনার ধরন ও এলাকা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অসমতা বিরাজ করছে। সরকার পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রায় সবই শহর এলাকায় অবস্থিত এবং অন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এগুলোর ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষকদের মান ও শিখনের সুযোগ সুবিধা অনেক ভালো। একই বিবেচনায় এরপরেই রয়েছে বেসরকারি স্কুলসমূহ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে শহরাঞ্চলের বেসরকারি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।
- মাধ্যমিক স্কুলসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকায় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা ভালো স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেলেও অন্যান্যরা ভর্তি হয় খুব একটা ভালো নয় এমন স্কুলে।

ভূমিকা ও উদ্দেশ্য

বিশ্বব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার যে চাহিদা ও বিস্তৃতি আজ লক্ষ্য করা যায় তা মূলত দুটি কারণে ঘটেছে – প্রথমত, শিক্ষার গণতন্ত্রায়ণ, দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন। তা সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষা আজ তিনটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন – বর্ধিষ্ণু অভিগম্যতা, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাক্রমকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা। বাংলাদেশের জন্যও এ চ্যালেঞ্জগুলো প্রযোজ্য। এখানেও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে (৮৭% নিট অভিগম্যতার হার) মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে। মেয়েরাও আগের চেয়ে অধিক হারে মাধ্যমিক শিক্ষামুখি হয়েছে।

*"The state of secondary education: quality and equity challenges." শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০৭)। সার-সংক্ষেপের অনুলিখন করেছেন আলতামাস পাশা।

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্তী সময়কাল সাত বছর যা মাধ্যমিক শিক্ষা নামে পরিচিত। এই সাত বছর তিনটি স্তরে বিভক্ত: নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক স্তরে তৃতীয় আর একটি ধারা হলো কারিগরি উপব্যবস্থা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৯.৪ শতাংশ পড়ছে সাধারণ উপব্যবস্থায়, ১৭.৯ শতাংশ মাদ্রাসা উপব্যবস্থায় আর মাত্র ২.৭ শতাংশ কারিগরি উপব্যবস্থায়।

আটটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথম বড় মাপের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় দশম শ্রেণীর পর, যা সাধারণ ও কারিগরি উপব্যবস্থায় মাধ্যমিক পরীক্ষা (এসএসসি) ও মাদ্রাসা উপব্যবস্থায় দাখিল পরীক্ষা নামে পরিচিত।

মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সংখ্যাগত দিক থেকে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তবে আগ্রহ হারাবার কারণে অষ্টম শ্রেণী থেকে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্য কমতে থাকে

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর বেশ কটি গবেষণা করা হয়েছে। এদেরই একটি করা হয়েছে *এডুকেশন ওয়াচ*-এর পক্ষ থেকে। যেখানে সাধারণ ও মাদ্রাসা উভয় উপব্যবস্থায় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরকে গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। এই গবেষণায় মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা, দক্ষতা, সমতা ও অর্থায়ন বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, নীতিপ্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তুলনামূলক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মৌলিক তথ্যের অভাব অনুভূত হচ্ছে। দুটি উপব্যবস্থার শিক্ষাক্রমের সমতা ও উপব্যবস্থাসমূহ থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের মানের সমতা নিয়ে প্রায়শই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। মাধ্যমিক পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা আর কতদূর পড়ালেখা করে এবং চাকরির বাজারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও দক্ষতা কী ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের দরকার রয়েছে। উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়সমূহে তথ্যের অপ্রতুলতা মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নে বাধাস্বরূপ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এডুকেশন ওয়াচ ২০০৭-এ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ দেখা হয়েছে:

১. সাধারণ ও মাদ্রাসা উপব্যবস্থার উদ্ভব, ক্রমোন্নয়ন ও শিক্ষাক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ,

২. উভয় উপব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষার শিখন উদ্দেশ্যের কতটুকু অর্জন করতে পারছে তা পরীক্ষা করা এবং তাদের যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা এবং
৩. মাধ্যমিক পাশ করা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষায় অভিগম্যতা ও চাকরির বাজারে তাদের অভিজ্ঞতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী অনুসন্ধান করা।

এই গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসসহ প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনসমূহ পর্যালেচনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উভয় উপব্যবস্থার শিক্ষকদের সঙ্গে কর্মশালা ও জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের অভিমত নেওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি অভীক্ষা তৈরি করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার শিখন উদ্দেশ্যসমূহ অভীক্ষা তৈরির ভিত্তি হিসেবে নেওয়া হয়েছে। চারটি বিষয়ে সমানভাবে মোট ৮০টি প্রশ্নের সমন্বয়ে এই অভীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে। বিষয় চারটি হচ্ছে, বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান। একই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। গবেষণার তৃতীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৭ সালে মাধ্যমিক পাশ করা শিক্ষার্থীদের ওপর একটি জরিপ করা হয়েছে। তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ দল শিক্ষার্থীর ওপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

দুই প্রজন্মের ব্যবধানে শিক্ষায় অভিগম্যতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা হচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম এবং তাদের বাবা-মা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে সরকারি বিদ্যালয়, শহরাঞ্চলের বেসরকারি বিদ্যালয়, গ্রামাঞ্চলের বেসরকারি বিদ্যালয়, শহরাঞ্চলের মাদ্রাসা ও গ্রামাঞ্চলের মাদ্রাসা।

মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষায় অভিগম্যতা ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা জানার জন্য ২৪৬টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা থেকে ১৯৯৭ সালে এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষায় পাশ করেছে এমন ২,৮৮৭ জনকে নেওয়া হয়েছে দৈবচয়নের ভিত্তিতে। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৪৮ জন প্রধান এবং ১,৪৭৮ জন অন্যান্য শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে তাদের অভিমত জানার জন্য।

গবেষণার ফলাফল

প্রথম বার্তাটি হলো, ব্যবস্থাপনার ধরন ও এলাকা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অসমতা বিরাজ করছে। সরকার পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রায় সবই শহরে অবস্থিত এবং অন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এগুলোর ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষকদের মান ও শিখনের সুযোগ-সুবিধা অনেক ভালো। একই বিবেচনায় রয়েছে শহরাঞ্চলের বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহ। তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে শহরাঞ্চলের মাদ্রাসাসমূহের। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে যথাক্রমে গ্রামীণ এলাকার বেসরকারি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা। বিদ্যালয়ের ধরনের উপরোল্লিখিত নাম এটাই নিশ্চিত করে যে, আমাদের শিক্ষার্থীদের খুব কম সংখ্যক ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে।

দ্বিতীয় বার্তাটি হলো, যথাযথভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করার মতো প্রয়োজনীয় পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে না থাকার ফলে এবং আদতেই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়িত না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত মানসম্পন্ন পড়ালেখা শিখতে পারছে না। মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এ কারণে দেখা যায় যে, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে পারে আর অন্যরা ভর্তি হয় তুলনামূলকভাবে খুব একটা ভালো নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে। এ ধরনের অবস্থা পর্যায়ক্রমে সামাজিক অসমতা বাড়িয়ে দেয়।

তৃতীয় বার্তাটি হলো, শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রে সাধারণ ও মাদ্রাসা উপব্যবস্থার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর ও তরুণদের বেড়ে ওঠার জন্য যে দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন তার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, দুর্বলভাবে প্রস্তুত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় না ঘটায় পার্থক্য শুধু বেড়েই চলছে।

চতুর্থ বার্তা হলো, মাধ্যমিক পর্যায়ের শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংখ্যাগত দিক থেকে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। খুব তাড়াতাড়ি মেয়েরা আগ্রহ হারাতে শুরু করে এবং অষ্টম শ্রেণী থেকে তাদের সংখ্যা

ছেলেদের তুলনায় কমতে শুরু করে। যদিও মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য বিশেষ বৃত্তি রয়েছে, তা সম্ভবত সমপরিমাণ শিখন যোগ্যতা অর্জনে যথেষ্ট নয়। বিয়ে ও দরিদ্রতার মত আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো মেয়েদেরকে অধিকতর শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখার মত যোগ্য করে তুলতে পারছে না।

পঞ্চম বার্তা হলো, শিক্ষার মানের নিরিখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন অনুসারে যে প্রাধিকার ব্যবস্থা ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে তার ফলে খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকেই মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া যাচ্ছে, যা তাদেরকে উচ্চশিক্ষা অথবা কর্মক্ষেত্রের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে। অন্যদিকে ব্যাপক সংখ্যক ছেলে-মেয়ে মাধ্যমিক স্তরের উপযুক্ত মৌলিক দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার কারণে কর্মক্ষেত্রে অথবা মাধ্যমিক উত্তর পড়ালেখার জন্য যথাযথভাবে গড়ে উঠছে না।

ষষ্ঠ বার্তা হলো, দুই প্রজন্মের ব্যবধানে আমাদের শিক্ষায় অভিগম্যতা বেশ বেড়েছে – এরা হলো বর্তমান প্রজন্ম ও তাদের মা-বাবা'রা। মা-বাবার শিক্ষার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সম্পর্ক এটা নিশ্চিত করে যে, আগের প্রজন্মের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধার প্রভাব বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার ওপর পড়েছে।

গবেষণালব্ধ সুপারিশমালা

এডুকেশন ওয়াচ ২০০৭ এর গবেষণার ফলাফল ও প্রধান বার্তাগুলোর আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা উপস্থাপিত হলো:

১. গবেষণায় দেখা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন উপব্যবস্থায় ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষার আয়োজনের মান ও সামর্থ্য, ভৌত অবকাঠামো, জনবল সবক্ষেত্রেই উপব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগের অসমতা, এর কারণসমূহ এবং এর ফলে যে অসমতা তৈরি হচ্ছে তা স্বীকার করে কেন্দ্রীয় নীতিপ্রণয়নে কাজে লাগানো দরকার।
২. একটি সমন্বিত ও একই মানসম্পন্ন শিখনব্যবস্থা, শিক্ষকবৃন্দ ও মৌলিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিখন উদ্দেশ্য হলো মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন।

এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা'হলো একটি কার্যকর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও একটি মেয়াদি পরিকল্পনা যেখানে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহ এবং মাদ্রাসা থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

৩. দশম শ্রেণী শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সব উপব্যবস্থার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালু করা দরকার। একই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুর প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা উন্নয়ন, পরীক্ষার মান প্রমিতকরণ, প্রধান বিষয়গুরোর জন্য শ্রেণী অনুযায়ী যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতদসংক্রান্ত, নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা দরকার।

৪. দুটি সমান্তরাল উপব্যবস্থা হিসেবে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহাসিক বিবর্তন অসম্পূর্ণ রাখার কোন অর্থ হয় না, যদিও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়টি নীতিগত প্রশ্ন হিসেবে থেকেই যাচ্ছে। জাতীয়ভাবে স্থিরকৃত শিক্ষাক্রম ও শিখন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে না এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারি অর্থ বরাদ্দ পাওয়া উচিত নয়।

৫. সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করতে হলে দরকার হবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ তৈরি করার জন্য একই ধরনের বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা। এটা স্বাভাবিকভাবেই ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ এবং সম্ভবত অবাস্তবও বটে। মধ্যম ধরনের একটি সমাধানের পথ হতে পারে চার-বিভাগ পদ্ধতি। এর অধীনে, সব সাধারণ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা এই চারটি বিভাগ খোলার অনুমোদন থাকবে। উপব্যবস্থা অনুসারে বিভাগসমূহের আবশ্যিক বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রমে কোন তফাৎ হবে না।

৬. জেন্ডার সমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন, কারণ এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্পর্কগত একটি বিষয় যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৭. মাধ্যমিক পাশ করা শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ মাধ্যমিকউত্তর শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত আসছে না বা এসেও পাশ

করতে পারছে না তাদের উপযুক্তভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার দরকার, যেন এরা কর্মবাজারে স্থান করে নিতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে, 'কারিগরি শিক্ষা'র বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, অনেকেই বিদেশে কাজ করতে যেতে আগ্রহী এবং সেখানে এখনো এ ধরনের কাজের চাহিদা রয়েছে।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:২০-২৪

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন: ব্র্যাক সামাজিক কর্মসূচি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণামূলক অনুসন্ধান*

ফজলুল করিম, নাঈমা কাইয়ুম, জিয়াউদ্দিন হায়দার ও কাজী নজরুল ফাত্তাহ

- ব্র্যাকের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৬ থেকে জুন ২০০৯-এর মধ্যে ৫০৭টি উপজেলার মধ্যে ৪৬৮টি উপজেলা থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত প্রচুর উপাত্ত সংগ্রহ করে। সংগৃহীত এসব উপাত্তসমূহের গবেষণামূলক বিশ্লেষণের জন্য ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি গবেষণা পরিচালনা করে।
- ধর্ষণ সবচেয়ে বেশি সংঘঠিত হয়েছে (৩১%)। এর পরেই স্থান পেয়েছে খুন, এসিড নিক্ষেপ, আত্মহত্যা, শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রচেষ্টা।
- ৮৬ শতাংশ ধর্ষিত নারী এবং ৭৩ শতাংশ শারীরিকভাবে নির্যাতিত নারী যে কোন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার দরিদ্র জনগণকে বিশেষ করে নারী ও শিশুদের সেই ১৯৮৬ সাল থেকে ব্র্যাক প্রতিরোধমূলক ও আপদকালীন উভয় ধরনের সহায়তা দিয়ে আসছে। ব্র্যাকের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি মানবিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসূচিভুক্তদের মধ্যে তাদের চাহিদা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলতে ও বুঝতে শেখায়। এভাবে তারা সামাজিকভাবে সংগঠিত হতে পারছে। নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, তাদের পাওনা দাবি করতে পারছে। ওয়ার্ড পর্যায়ে পল্লী সমাজ ও ইউনিয়ন সমাজ গঠনের মাধ্যমে ব্র্যাকের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি দরিদ্র মানুষের বিশেষ করে নারীদের সামাজিক, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, সরকারি-বেসরকারি সেবা-সম্পদ আদায়, গ্রামীণ

*"Human rights violation in Bangladesh: lessons learned from the information gathering system of BRAC social development programme" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

ক্ষমতা কাঠামোতে অংশগ্রহণ করাসহ নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। অপরদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত বিভিন্ন ঘটনা বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি সকল স্তরের জনগণকে সচেতন করার জন্য কাজ করছে। এক্ষেত্রে পল্লী সমাজ একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের ভূমিকা পালন করছে।

এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, খুন ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে জানার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাঠ পর্যায় থেকে প্রধান কার্যালয়ে খবর পাঠানো হয়। ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠকদের পাঠানো এসব তথ্যের উপর নির্ভর করে ব্র্যাক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার এসব ভিকটিমকে জরুরি চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদান করে থাকে, এবং তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। প্রায় ৩৪০ জন প্রশিক্ষিত কর্মসূচি সংগঠক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ করে ব্র্যাক হেড অফিসে নিয়মিত প্রেরণ করে। তারা নিবিড়ভাবে ওয়ার্ডসমূহের প্রায় ৩০% এলাকায় কাজ করছে যা বাংলাদেশের ৯৫% জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করছে। এর মাধ্যমে দেশব্যাপী সংগঠিত সন্ত্রাসের বিভিন্ন উপাত্ত সংগৃহীত হচ্ছে। সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের কার্যক্রমের বাইরেও বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা, সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তির অভিভাবক, আত্মীয়, প্রতিবেশী, পল্লী সমাজ, ব্র্যাকের অন্যান্য কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মসূচি সংগঠক এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য বা চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহকেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রামান্য দলিল হিসেবে কাজে লাগায়। জানুয়ারী ২০০৬ থেকে জুন ২০০৯-এর মধ্যে এই কর্মসূচি মোট ৫০৭টি উপজেলার মধ্যে ৪৬৮টি উপজেলা থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনীত প্রচুর উপাত্ত সংগ্রহ করে। বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণের সহজ পদ্ধতি বের করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি তিনবার উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির পরিবর্ধন করেছে। বর্তমানে সংগৃহীত এই উপাত্তসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। আর তাই ব্র্যাকের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সহযোগিতায় গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপাত্তের উপর সম্প্রতি একটি গবেষণা পরিচালনা করে।

ব্র্যাকের কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্তদের ক্ষেত্রে ধর্ষণ ও খুন হবার সম্ভাবনা কম হলেও এসিড হামলা, আত্মহত্যা এবং শারীরিকভাবে নির্যাতিত হবার হার বেশি ছিল

গবেষণালব্ধ ফলাফল

২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ৩,০০০ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ৬১টি জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। দেখা যায়, ধর্ষণ সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়েছে (৩১%), এর পরেই রয়েছে খুন (২৫%), এসিড নিক্ষেপ (১৫%), আত্মহত্যা ১২%, (ধর্ষণের কারণেও আত্মহত্যা সংঘটিত হয়), শারীরিক নির্যাতন (৭%) এবং ধর্ষণের প্রচেষ্টা (৭%)। গবেষণা উপাত্ত থেকে দেখা যায়, পনেরো বছরের কমবয়সী কিশোরীরা সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হয় (৫০% ধর্ষনের ঘটনা ও ৫৯% ধর্ষণের প্রচেষ্টা)।

যারা ব্র্যাকের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের ক্ষেত্রে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হবার সম্ভাবনা কম ছিল, তবে এরা এসিড হামলা, আত্মহত্যা এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার বেশি হয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে অপরাধমূলক কাজ যা আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার বহু মানুষ আইনি সহায়তা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। মাত্র ৬৩% আক্রান্ত ব্যক্তি এক্ষেত্রে কোর্টের আশ্রয় নিতে পেরেছে। এক্ষেত্রে মহিলাদের আইনের আশ্রয় নেবার হার ছিল ৬৫% এবং পুরুষদের ৫৭%। ধর্ষণজনিত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের ৪২% মামলা রুজু করতে পেরেছে এবং বাকিরা মামলা থেকে বিরত থাকে। খুনের ঘটনায় পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি মামলা রুজুর (৫৮%) ঘটনা ঘটেছে। এ হার মহিলাদের ক্ষেত্রে ছিল ২৩%।

গবেষণায় দেখা যায়, অপরাধীরা ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব সব শ্রেণীতেই সমানভাবে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ ধর্ষণজনিত অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ৩৫% হচ্ছে ধনী, ৩৬% মধ্যবিত্ত এবং ২৮% গরিব শ্রেণীভুক্ত। খুন, এসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্থক্য দেখা যায় নি।

এসিড সন্ত্রাসের শিকার ৭৫.৬% আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসাসেবা পেয়েছে। খুনের ঘটনায় এ হার ছিল ৩৯% এবং শারীরিক নির্যাতনের হার হচ্ছে ২৭%। ধর্ষণের ঘটনায় চিকিৎসা সেবা পেয়েছে ১৪%, আত্মহত্মার ক্ষেত্রে ১৩% এবং খুনের প্রচেষ্টায় ১৪%।

উপসংহার

গবেষণায় দেখা গেছে, ধর্ষণের পর অনেক সময় ধর্ষিতাকে যেমন হত্যা করা হয়েছে, তেমনি ধর্ষণের কারণে সম্মানহানীর ভয়ে আত্মহত্যা ও খুনের বহু ঘটনাও ঘটেছে। এসব আত্মহত্যা বা খুনের ঘটনার পেছনে যৌন সহিংসতা বা নির্যাতনযুক্ত রয়েছে। যদিও এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা সববয়সী নারী পুরুষের মধ্যেই দেখা যায়, তথাপি বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় বা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়তে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় নারীদের মধ্যে এই ঝুঁকি উচ্চমাত্রায় বিদ্যমান। আতংকিত হবার মতো কারণ হচ্ছে এই যে, ৮৬% ধর্ষিতা নারী এবং ৭৩% শতাংশ শারীরিকভাবে নির্যাতিতা নারী যে কোন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। মানবাধিকারের এ ধরনের লঙ্ঘন হচ্ছে একটি অপরাধমূলক প্রবণতা এবং যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে তা ব্যাহত করে। তাই, সমাজ জীবনের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তিশালী ঐকমত্য গড়ে তোলা দরকার।

মানবাধিকার লঙ্ঘন টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে দরকার প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি। বাংলাদেশে বেসরকারি সংগঠনগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যেসব কর্মসূচি পরিচালনা করছে তাতে সামর্থ্যের দিক থেকে স্বল্পতা যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখা যায় সরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। ফলে এসব কার্যক্রম সহিংসতার শিকার মানুষকে যেমন সহায়তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, তেমনি নির্ভরযোগ্য উপাত্তের স্বল্পতার কারণে সমস্যাটির বাস্তব চিত্র পাওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়ছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি অপরাধমূলক প্রবণতা যা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। সমাজে এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে

স্বল্পসংখ্যক সংগঠন যেমন ব্র্যাক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট সন্ত্রাসের সামগ্রিক কারণ প্রতিরোধে সচেষ্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি পুরোভাগে রয়েছে। তবে সম্পদ স্বল্পতার কারণে এই কার্যক্রমের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না। তাই, বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনাসমূহ মোকাবিলায় ব্র্যাক সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য নেওয়া ব্যবস্থাসমূহকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এসব ব্যবস্থার সঙ্গে

যুক্ত করতে হবে পর্যাপ্ত পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং আইনি সহায়তা কার্যক্রম। কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ব্র্যাক সমমনা সংগঠনসমূহ ও সরকারিখাতকে নিয়ে একটি কনস্যাটিয়াম গঠন করতে পারে। মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি অপরাধমূলক কাজ যা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করে। তাই, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সবার ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:২৫-৩১

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরিচ্যুত কর্মীদের জন্য ব্র্যাকের সামাজিক নিরাপত্তা প্যাকেজ: একটি সার্বিক মূল্যায়ন*

নারায়ণ চন্দ্র দাস, নাঈমা কাইয়ুম, মেহজাবীন খান ও ফজলুল করিম

- ব্র্যাকের সামাজিক নিরাপত্তা প্যাকেজ 'কল্যাণ প্রকল্পের' মূল উদ্দেশ্য ছিল চাকুরিচ্যুত কর্মীদের দক্ষতামূলক কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্র্যাক প্রদত্ত ঋণের সহায়তায় নতুন আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত করা।
- কল্যাণ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যবসা করার প্রবণতা বেশি ছিল।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারিকরনের ফলে চাকুরিচ্যুত কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের জীবনমানের কার্যকর উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক অন্যান্য কতিপয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় একটি সামাজিক নিরাপত্তা প্যাকেজ শুরু করে যা 'সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প' নামে সমধিক পরিচিত। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিল্প কারখানার চাকরিচ্যুত কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের জীবিকার ঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জীবনের উন্নতি ঘটানো ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পে কর্মীদের যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলো হল গার্মেন্টস, ডাইং প্রিন্টিং, কাঠের ব্লক প্রিন্টিং ও টেইলারিং; হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, মাছচাষ ও সবজিচাষ; ড্রাইভিং ও গাড়ি মেরামত; ওয়েল্ডিং, পাইপ ফিটিং, রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশন মেরামত; পাটশিল্প, বুনন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ইস্পাত শিল্প; রেডিও-টেলিভিশন মেরামত ও মোবাইল সার্ভিসিং; এবং হস্তজাত বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী।

*'Social protection package for the retrenched workers of state-owned enterprises: a quick assessment.' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

তবে উল্লেখিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত খানাসমুহের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়তা এবং আয়-বর্ধক কাজের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয় যাতে করে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাকের কল্যাণ প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন করা। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত খানাসমূহের মানুষের জীবনযাত্রায় কী প্রভাব পড়েছে তা অনুধাবন করা। বিশেষভাবে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে সুবিধাভোগীদের চাকরি ও আয়ের ক্ষেত্রে, সম্পদের ক্ষেত্রে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়েছে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্র্যাকের অন্যান্য সৃজনশীল কর্মসূচির মধ্যে 'কল্যাণ প্রকল্প' ছিল অন্যতম। চাকরিচ্যুত বা ছাঁটাই হওয়া কর্মচারীদের নিয়ে কাজ করা সহজ কাজ নয়। কারণ এরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় এদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল ২০০৫ সালের জুলাই মাসে এবং সমাপ্ত হয় ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই প্রকল্পটি চাকুরিচ্যুত কর্মচারীদের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়নে তাদের সম্পদ বা মূলধন গড়ে তুলতে ও সঠিকভাবে তা ব্যবহারে সহায়তা দিয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, চাকরির নিরাপত্তা বিধান, খানাসমূহে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ ও খানার শিশুদের জন্য শিক্ষাভাতারও ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য সার্ভিসসমূহ যৌথভাবে ব্যবহার করে সুবিধাভোগীদের জীবনমানের কার্যকর উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।

'কল্যাণ প্রকল্প' একটি সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা প্যাকেজ হিসেবে চাকুরিচ্যুত কর্মীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক হতে পারে

'কল্যাণ প্রকল্পের' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৪৬,৬৮৯টি খানাকে প্রকল্পের আওতায় আনা গেছে। এসব খানায় অবস্থানকারী চাকুরিচ্যুত সকল কর্মী প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য পরামর্শ লাভ করেছে। এটা লক্ষ্যমাত্রার ৪৫,০০০ খানার চেয়েও ৪% বেশি। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রার ৯৬% অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে ২২,২১৪ জন কর্মী বা খানা সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে যুক্ত করা সম্ভবপর হয়। মোট ১৩,১৩৭ জন কর্মী ও খানাসদস্য ক্ষুদ্রঋণ লাভ করেন, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫% বেশি। চাকুরিচ্যুত কর্মীদের ১৫,৪২৩ জন শিশু

শিক্ষাভাতা লাভ করে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪% বেশি ছিল। চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০০, যেখানে অর্জিত হয়েছে ১,১৩৯।

কল্যাণ প্রকল্পের এলাকা ব্যবস্থাপকের মতে, প্রকল্পটি সর্বোচ্চ সফলতা পেয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্রঋণে। কিন্তু প্রকল্পে দক্ষতা প্রশিক্ষণ (Skill training) অংশটির ব্যবহার কম ছিল। প্রকল্পটি মূল্যায়নের আগ পর্যন্ত (২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ক্ষুদ্রঋণ এই প্রকল্পের সবচেয়ে সাফল্যজনক বিষয় ছিল। শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমটি বিশেষভাবে সফলতা পেয়েছে। কর্মচারীরা শিক্ষাভাতা পাবার জন্য তাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহী ছিল। এই প্রকল্পের আওতায় আসার পূর্বে কর্মচারীদের আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় হত গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসায়। অবশ্য এই 'কল্যাণ প্রকল্পে' অংশ নেবার ফলে জরুরি চিকিৎসা সেবায় ব্যয়সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, 'কল্যাণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর একটা বিশাল অংশে ছাগল, নৌকা, সিলিং ফ্যান এবং মোবাইল ফোন তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। অপরদিকে প্রকল্পভুক্ত নয় এমন খানার ক্ষেত্রে গরু পালনের সংখ্যা যেমন বেশি ছিল, তেমনি বেশি ছিল রিক্সা/ভ্যান গাড়ির সংখ্যাও।

'কল্যাণ প্রকল্পের' মূল উদ্দেশ্য ছিল চাকুরিচ্যুত কর্মীদের দক্ষতামূলক কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্র্যাক প্রদত্ত ঋণের সহায়তায় নতুন আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত করা। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে চাকরি বা কাজ পাওয়াকে প্রধান বিষয় হিসেবে মনে করা হয়েছে। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী এবং প্রকল্পভুক্ত নন এই দু'ধরনের খানার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যবসা করার প্রবণতা বেশি ছিল। অংশগ্রহণকারী চাকুরিচ্যুত কর্মীদের ২৬%-এর প্রধান পেশা ছিল ব্যবসা। প্রকল্পভুক্ত নয় এমন চাকুরিচ্যুত কর্মীদের ক্ষেত্রে এ হার ছিল ১৮%। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে অংশগ্রহণকারীদের একটি বিরাট অংশ ব্যবসায় জড়িত হয়েছে। অবশ্য এই বিশ্লেষণে শুধুমাত্র চাকুরিচ্যুত কর্মীদের প্রাথমিক পেশা দেখানো হয়েছে, খানা সদস্যদের সামগ্রিক পেশাগত পরিবর্তনের চিত্র এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়।

গবেষণায় দেখা যায় ৭% অংশগ্রহণকারী খানার মানুষ বিগত একবছরব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করেছে, যেখানে প্রকল্পভুক্ত নয় এমন খানার

ক্ষেত্রে এই হার ছিল ১৫%। অবশ্য প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ও অংশগ্রহকারী নয় উভয় ক্ষেত্রেই অর্ধেকেরও বেশি খানায় খাদ্য ঘাটতি দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে। প্রকল্পে অংশ নেয়া খানাসমূহে খাদ্য উদ্বৃত্ত খানার হার ছিল বেশি।

ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ তাৎক্ষণিক আর্থিক চাহিদাপূরণে সহায়ক হয়। ব্যবসার জন্য সম্ভাব্য মূলধন যোগাতেও এটা সহায়ক হয়। গবেষণায় দেখা যায়, আর্থিক সুবিধা পাবার জন্য প্রকল্পভুক্ত খানা সদস্যদের সঞ্চয় করার প্রবণতা প্রকল্পভুক্ত নয় এমন খানার প্রেক্ষাপটে একই রকম থাকে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহে (যেমন এনজিও এবং ব্যাংক) সঞ্চয় করলে সুদ পাওয়া যায়। অবশ্য গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রকল্পভুক্ত ও প্রকল্পভুক্ত নয় উভয় খানার ক্ষেত্রেই ৪০% অংশগ্রহণকারী তাদের সঞ্চয় এসব প্রথাগত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে রাখে। বিদ্যমান দায়-দেনার বিশ্লেষণে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ও অংশ নেয়নি উভয়ের ক্ষেত্রে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায় না। মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা উভয় খানার ক্ষেত্রেই ন্যূনতম ছিল। অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের ক্ষেত্রে বেশি ছিল।

স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ও প্রকল্পভুক্ত নয় উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার যথেষ্ট বেশি ছিল (৯২% বনাম ৮৮%)। উভয় খানার ক্ষেত্রেই অসুস্থতার ধরণ ছিল অভিন্ন। তবে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের হার প্রকল্পভুক্তদের মধ্যে বেশি ছিল। এটা থেকে বোঝা যায় যে, অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে কল্যাণ প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব পড়ায় তারা চিকিৎসা সেবা গ্রহণে উৎসাহী ছিল। অবশ্য চিকিৎসা ব্যয় বহনে অংশ নেয় নি এমন খানার তুলনায় অংশগ্রহণকারী খানাগুলো ধার দেনায় বেশি নির্ভরশীল ছিল। অপরদিকে প্রকল্পে অংশ না নেওয়া খানাসমূহ তাদের নিজস্ব আয় রোজগারের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল।

প্রকল্পভুক্ত খানাগুলোর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী কন্যা শিশুর ৮৯% বিদ্যালয়ে যায়। অপরপক্ষে প্রকল্পভুক্ত নয় এমন খানার ক্ষেত্রে এ হার হচ্ছে ৮০%। আবার ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত খানায় বিদ্যালয়ে যাবার হার হচ্ছে ৭৯% এবং প্রকল্পভুক্ত নয় এমন খানার ক্ষেত্রে এই হার হচ্ছে ৭৪%। আবার উভয় ধরনের খানার ক্ষেত্রেই কন্যা শিশুর অন্তর্ভুক্তির হার বেশি ছিল ছেলে শিশুর তুলনায়।

প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় জীবিকার জন্য সম্পদ, চাকরি, খাদ্যের সংস্থান, অর্থনৈতিক বাজারে অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, শিক্ষা উপাদানগুলো কোনটি বেশি সহায়ক ও কার্যকর। বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৩%-এর মত হচ্ছে কোন উপাদানই জীবিকার জন্য সহায়ক নয়। ঋণ গ্রহণকে ২৮% জীবিকার উন্নয়নে সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করে। অন্যদিকে ২২%-এর মতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ জীবিকার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় প্রকল্প চালানোর সময় উল্লেখিত কোন কোন উপাদানসমূহ অব্যাহত রাখতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের ৮% জানায় প্রকল্পের সকল উপাদানকেই অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা ছিল এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার পক্ষে মতামত এসেছে ২৯%। এরপরেই স্থান পেয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ (২৬%)। স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন তুলনামূলক কম গুরুত্ব পেয়েছে।

'কল্যাণ প্রকল্পটি' কী ধরনের গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে তা জানতে চারটি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়। এসব কেস স্টাডির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি কেস স্টাডি থেকে জানা যায় জনাব 'খ' (গবেষণার নীতি অনুযায়ী নাম গোপন রাখা হল) চাকরিচ্যুত হবার আগে আদমজি জুট মিলে ২/৩ বছর ধরে কাজ করত। এমনকি মিল বন্ধ হবার আগেও নিজের স্বল্প আয়ে পাঁচ সদস্যের সংসার চালানো তার পক্ষে দুরুহ ব্যাপার ছিল। জনাব 'খ' এর ছিল দুই ছেলে এবং এক মেয়ে। চাকুরিচ্যুত হবার সময় তার মেয়ে ও ছোট ছেলে স্কুলে ভর্তি হয়। বড় ছেলেটি পঞ্চম শ্রেণী পাস করার পর দর্জির কাজ শিখতে শুরু করেছিল। তার বসতভিটা এবং চাষযোগ্য কিছু জমিও বর্তমান ছিল।

আদমজি জুট মিল বন্ধ থাকার কারণে মি. 'খ' ২,১০,০০০ টাকার পেনশন লাভ করেছিল। এই টাকা থেকে সে ১০০,০০০ টাকার ঋণ পরিশোধ করে। বাদবাকী টাকায় সে বসতভিটায় একটি বাড়ি বানায়। তারপর স্থানীয় বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে সে পানের ব্যবসা দেয়। তার বড় ছেলে ১,২০০ টাকা বেতনে দর্জির কাজ শুরু করে। ছোট ছেলেটিও গার্মেন্টস কর্মীর কাজ পায়। এর মধ্যেই এক

লাখ টাকা ধার করে জনাব 'খ' তার বড় মেয়ের বিয়ে দেয়। এই ঋণ পরিশোধে সে ৬০,০০০ টাকায় তার বাড়িটি বিক্রি করে দেয়।

পরবর্তী সময়ে ২০০৭ সালে 'কল্যাণ প্রকল্প' তাকে চাকুরিচ্যুত কর্মী হিসেবে সনাক্ত করে প্রকল্পভুক্ত করে। জনাব 'খ' জানান প্রশিক্ষণের সময় ব্র্যাক তাকে ৭৫ টাকা যাতায়াত বাবদ দিয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণকালীন দুপুরের খাবারও প্রদান করা হয়েছিল্ 'কল্যাণ প্রকল্পে' থাকাকালীন সময়ে তার কোন ছেলে-মেয়েই স্কুল গমনকালীন না হওয়ার কারণে কোন শিক্ষাভাতা পায় নি। তবে মি. 'খ' ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তার বড় ছেলের জন্য দর্জির দোকান দেন। তার ব্যবসা ভালই চলছিল। তাই প্রথম ঋণ পরিশোধের পরে তিনি আরও ৫০,০০০ টাকার দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ গ্রহণ করেন ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য। তাঁর দর্জির দোকানের ব্যবসার কলেবর আরও বৃদ্ধি পায়। সে ৩-৪ জন কর্মী নিয়োগ দেয়। নিজের ছোট ছেলে গার্মেন্টস কারখানার চাকরি থেকে যথেষ্ট আয় না করায় তাকেও ব্যবসায় লাগিয়ে দেয়া হয়। দর্জির দোকান থেকে মাসে তার প্রায় ১৫,০০০ টাকা আয় হতে থাকে। এরপর সে নতুন বাড়ি তৈরির আশা মনের মধ্যে লালন করতে থাকে। 'কল্যাণ প্রকল্পের' সহায়তায় সে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার শুরু করে। তার জীবনযাত্রার সার্বিক উন্নয়নে 'কল্যাণ প্রকল্পের' প্রাপ্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ খুবই সহায়ক হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

'কল্যাণ প্রকল্পের' বিভিন্ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় প্রারম্ভিক উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে এই প্রকল্প যথেষ্ট সফল হয়েছে। কর্ম উদ্যোগ সৃষ্টির হার প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে আরও দেখা যায় যে, সম্পদ অর্জনে, মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধিতে, খাদ্য নিরাপত্তার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা যথেষ্ট ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

'কল্যাণ প্রকল্প' পরিচালনার মাধ্যমে ব্র্যাক অনেক কিছু জানতে সক্ষম হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয় নীচে উপস্থাপিত হল:

১. চাকুরিচ্যুত কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে। কারণ চাকুরিচ্যুত হবার পর তারা অনেকেই নিজেদের স্থায়ী ঠিকানায় ফিরে যায়, যেখানে তাদের

পারিবারিক কিছু না কিছু সম্পদ রয়েছে। তাই এদের খুঁজে পাবার জন্য মিল-কারকানার কাছাকাছি এলাকায় এবং তাঁদের স্থায়ী বাসস্থানে যাবার প্রয়োজন হয়। এ ধরনের প্রচেষ্টায় দরকার হয় পর্যাপ্ত সময়ের, সম্পদের এবং নমনীয়তার।

২. প্রকল্প বাস্তাবায়নে নীতিমালার উপর নির্ভরশীলতা বিবেচনায় নিতে হবে, ব্যক্তি ও সরকারি খাতে সহযোগিতা শক্তিশালী করতে হবে এবং একটি অভিন্ন ফোরাম গঠন করতে হবে প্রকল্প প্রণয়নে যাতে এসব লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হয়। এই প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করতে হবে। এর ফলে নীতিনির্ধারণে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা সম্ভবপর হবে ও মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা সবার সঙ্গে বিনিময় করাও সম্ভব হবে।

৩. সীমিত দক্ষতা বা বাণিজ্যিক উদ্যোগ গ্রহণে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বেশিরভাগ ঋণ দরখাস্তকারী অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষুদ্রঋণের আবেদনকারী হিসেবেই রয়ে যায়।

তাই, প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের সার্বিকভাবে উৎসাহিত করা উচিত। তাদের প্রয়োজন অনুসারে ঋণের সঙ্গে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সম্মিলন ঘটানো এক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য কৌশল হওয়া উচিত। দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের সঙ্গে ক্ষুদ্র ঋণের সম্মিলন ঘটানো অথবা কর্মসূচির প্রশিক্ষণের বিষয় হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

একটি সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা প্যাকেজ হিসেবে 'কল্যাণ প্রকল্প' চাকরিচ্যুত কর্মীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে কার্যকর হতে পারে। তাই 'কল্যাণ প্রকল্পে' ঈষৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও বেশি সুবধিাভোগীকে এর আওতায় আনা যেতে পারে যারা এখনও এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারে নি।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:৩২-৩৫

অতিদরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) কর্মসূচির একটি মূল্যায়ন*

অনন্ত নীলিম

- অতিদরিদ্র খানা নির্বাচনে খানা প্রধানের বয়স গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।
- নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের হার অতিদরিদ্র খানার জন্য বেশি ছিল। নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র খানাসমূহ কোন অবস্থাতেই পিছিয়ে নেই।
- গবেষণাভুক্ত ২৪টি গ্রামের বেশিরভাগ খানাতেই পরীক্ষিত নিরাপদ পানি ব্যবহার করা হয় না। প্রায় ৭.৩% খানার মানুষ আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করে।

ব্র্যাক বাংলাদেশের পল্লী এলাকার ১৫০টি উপজেলায় ১০০% নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা দেবার লক্ষ্যে ২০০৬ সাল থেকে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (Water, Sanitation and Hygiene বা WASH) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এই লক্ষ্য অর্জনে ওয়াশ কর্মসূচি পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি তথা স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ ও অনুশীলনগত পরিবর্তনে সচেষ্ট রয়েছে।

ব্র্যাক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রাপ্ত তথ্য থেকে ওয়াশ কর্মসূচি অতিদরিদ্রদের চিহ্নিত করে তাদের ন্যূনতম চাহিদাপূরণে বিশেষ পদ্ধতির সহায়তা নিয়েছে, যেমন আর্থিক

*'From selection to implementation: evaluation of the water, sanitation and hygiene (WASH) programme's approach towards the ultra poor.' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০৮)। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

উপার্জনের ব্যবস্থা করা যাতে করে তারা পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যগত আচরণে পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। ওয়াশ কর্মসূচি অতিদরিদ্র খানা নির্বাচনে ৬টি নির্ণায়কের মধ্যে কমপক্ষে ৩টিকে প্রাধান্য দেয়। এই ছয়টি নির্ণায়ক হচ্ছে – ভূমিহীন, গৃহহীন, স্থায়ী আয়ের কোন উৎস নেই, কৃষি জমির পরিমাণ ১০ ডেসিমেলের নীচে, খানার প্রধান উপার্জনকারী দিনমজুর হিসেবে কাজ করে, এবং খানা প্রধান হচ্ছে প্রতিবন্ধী বা মহিলা যার বয়সসীমা ৬৪ বছর পার হয়ে গেছে। এই নির্ণায়কগুলোর কমপক্ষে ৩টি পূরণ করে ওয়াশ এলাকায় এমন খানার হার ১৫.৫%।

সমাজের অন্যান্য অংশের চেয়ে অতিদরিদ্ররা নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। মূলত দারিদ্র্যই এর মূল কারণ। নিজস্ব নিরাপদ পানির উৎস, যেমন টিউবওয়েল এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকাটাও এর একটি অন্যতম কারণ। তাই ওয়াশ কর্মসূচি তাদেরকে এই সুবিধাগুলো সৃষ্টি করে দেয়াসহ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে।

আলোচ্য গবেষণাটির মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে ওয়াশ কর্মসূচিটি হতদরিদ্রদের কোন স্তরে সেবা প্রদান করছে। এক্ষেত্রে অতি দরিদ্র খানাসমূহ কীভাবে নির্বাচন করা হয়েছে তা দেখা হয় এবং ওয়াশ কর্মসূচির বিভিন্ন গরিব-বান্ধব নীতিমালা সমূহের কার্যকারিতা ও সাফল্যের মূল্যায়ন করা হয়। এ উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচির তিন পর্বের তিনটি উপজেলার (ঝিকরগাছা, শ্রীমঙ্গল ও কাপাসিয়া) ২৪টি গ্রাম থেকে মোট ১,২০০ খানা নির্বাচন করা হয় তথ্যসংগ্রহ করার জন্য। গবেষণাটি করা হয় ২০০৮ সালের জুলাই মাসে।

ফলাফল

অতিদরিদ্র খানা নির্বাচন

ওয়াশ শুমারীর উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় জরিপভুক্ত খানা প্রধানের বয়স লিপিবদ্ধ করা হয় নি বিধায় বহু ক্ষেত্রেই খানা প্রধানের বয়স কত তা জানা যায় নি। অতিদরিদ্র খানা নির্বাচনে খানা প্রধানের বয়স গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ, খানা নির্বাচনে এর পরোক্ষ প্রভাব থাকে।

ঝিকরগাছায় ওয়াশ শুমারী অনুসারে অতিদরিদ্র খানার অনুপাত ছিল ১৩.৫%। অবশ্য প্রশ্নোত্তর (Cross exam) থেকে জানা গেছে এই হার হচ্ছে ২৪.৮%, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৮৩.৩% বৃদ্ধি ঘটেছে। দেখা গেছে যে, খানার সম্পত্তির পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখিত হয় নি। এক্ষেত্রে ৪০০টি কেসের মধ্যে ৬৫টিতে ভ্রান্তির হার ছিল ১৬.৩%।

ঝিকরগাছার মতো কাপাসিয়াতেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে অতিদরিদ্র খানা সনাক্তকরণে। বেইজলাইন জরিপ অনুসারে ৬.৩% ছিল অতিদরিদ্র খানা। প্রশ্নোত্তর শেষে এই পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়ায় ১০.৬%। আরও দেখা যায় যে, ৮.৮% খানার দরিদ্র অবস্থা নির্ণয়ে ভ্রান্তি ছিল।

সুনির্দিষ্ট ওয়াশ নীতিমালার কার্যকারিতা

স্যানিটেশন

ঝিকরগাছায় সবচেয়ে বেশি স্যানিট্যারি সুবিধাদি দেখা যায় (৪২.১%), যেখানে কাপাসিয়ায় ছিল ৩৯.৮% এবং শ্রীমঙ্গলে ২৬.৭%। শ্রীমঙ্গলে ৫.৮%, ঝিকরগাছায় ৬.০% এবং কাপাসিয়ায় ১৬.৩% খানা সদস্য উন্মুক্ত স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করে। এক্ষেত্রে অতিদরিদ্র খানার সদস্যদের প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে (২১%)। অথচ অতিদরিদ্র নয় এমন খানার ক্ষেত্রে এ হার ছিল ৭.৮%। ব্র্যাকের বেইজলাইন জরিপ-এর (২০০৮) উপাত্তের সঙ্গে এই গবেষণার প্রাপ্ত উপাত্তের সাদৃশ্য রয়েছে।

নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের হার তুলনামূলকভাবে অতিদরিদ্র খানার জন্য বেশি ছিল। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র খানাসমূহ সমাজের বাদবাকী অংশের চেয়ে কোন অবস্থাতেই পিছিয়ে নেই।

এই গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, অতিদরিদ্র নয় এমন খানার লোকজন তাদের নিজ খরচে ল্যাট্রিন তৈরি বা উন্নত করেছে। অন্যদিকে অতিদরিদ্রদের মধ্যে বিদ্যমান ল্যাট্রিনের উন্নয়ন বা নতুন ল্যাট্রিন বসানোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনজিও বা সরকারি আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেছে।

পানি

দেখা গেছে, গবেষণাভুক্ত ২৪টি গ্রামের বেশিরভাগ খানাতেই পরীক্ষিত নিরাপদ পানি ব্যবহার করা হয় না। প্রায় ৭.৩% খানার মানুষ আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করে। ঝিকরগাছার অবস্থা এক্ষেত্রে বেশ খারাপ। এখানে আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েলের সংখ্যা ২০.৮%। কাপাসিয়া ও ঝিকরগাছায় আর্সেনিকমুক্ত পানি ব্যবহারকারী খানার সংখ্যা ৫২% এর বেশি, তবে শ্রীমঙ্গলে এই হার ১৬.৬%। শ্রীমঙ্গলে ৭৭.৮% টিউবওয়েলে আর্সেনিক রয়েছে কী না তা পরীক্ষা করা হয় নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তুলনামূলকভাবে অতিদরিদ্র খানাসমূহ আর্সেনিকযুক্ত ও অনিরাপদ পানি বেশি ব্যবহার করছে।

উপসংহার

নতুন স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসানোর চেয়ে বিদ্যমান ল্যাট্রিন উন্নয়নে খরচ যথেষ্ট কম লাগে। এক্ষেত্রে ওয়াশ কর্মসূচি অতিদরিদ্র খানাসমূহের ল্যাট্রিন উন্নয়নে ক্ষুদ্র আকারে মূলধন প্রদান করতে পারে। আর তা'হলে এ ধরনের বহু খানায় কম খরচে নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা দেয়া সম্ভব হবে।

গবেষণাভুক্ত এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যবহার সামগ্রিকভাবে খুব একটা ভালো ছিল না। বেশিরভাগ খানার সদস্যই আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করেন না। তাই আলোচ্য এলাকায় আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছেন এমন মানুষও রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অতিদরিদ্র খানাসমূহে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করা মানুষের সংখ্যা যেমনটা আশা করা গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি ছিল। অর্থাৎ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যতাও একটা প্রভাবক হিসেবে এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

যদিও এক্ষেত্রে অতিদরিদ্রদের পানি ব্যবহারে কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই, তবুও ওয়াশ কর্মসূচির এক্ষেত্রে সর্তক দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে যে কোন কার্যক্রম নেবার সময় গুরুত্বারোপ করতে হবে টিউবওয়েলগুলো আর্সেনিকমুক্ত কী না তা নিশ্চিত করা। এসব কাজ করা গেলে পানি ব্যবহারের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি হবে যা অতিদরিদ্র খানাসমূহের উপরও প্রভাব ফেলবে।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:৩৬-৩৮

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর সম্পদ হস্তান্তরের প্রভাব*

আখতার আহমেদ, মেহনাজ রাব্বানী, মুন্সী সুলাইমান ও নারায়ণ চন্দ্র দাস

- ব্র্যাকের অতিদরিদ্র কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে খানাসমূহের সম্পদ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।
- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের গৃহপালিত গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। যেহেতু এই কর্মসূচির আওতায় প্রধানত গরু ছাগল এবং হাঁস-মুরগি হস্তান্তর করা হয় তাই এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি তেমন বিস্ময়কর বিষয় নয়।
- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী খানার ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির কোন প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় নি।
- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কারণে খানাসমূহে স্যানেটারী ল্যাট্রিনের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে ব্র্যাক ২০০২ সাল থেকে শুরু করেছে বিশেষ এক কর্মসূচি যা দারিদ্র্য বিমোচনের সনাতন মডেল থেকে ভিন্ন। এই কর্মসূচিটি Challenging the frontiers of poverty reduction – targeting the ultra poor (CFPR/TUP) নামে সমধিক পরিচিত। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে আসা যেখান থেকে তারা উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে। এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সুবিধাভোগী অতিদরিদ্র মহিলারা ব্র্যাকের কাছ থেকে বিভিন্ন মাত্রার সহায়তা লাভ করে। এসব সহায়তা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আয়মূলক কাজের উপর

*'The impact of asset transfer on livelihoods of the ultra poor in Bangladesh.' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

প্রশিক্ষণ, সম্পদ হস্তান্তর, সহায়ক ভাতা প্রদান (subsistence allowance), স্বাস্থ্য ও আইনগত সেবা প্রদান এবং তাদের জন্য সামাজিক সহায়তার নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে (২০০২) যাদেরকে সদস্যপদ হস্তান্তর করা হয়েছে তাদের উপর কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে আলোচ্য গবেষণায় জানার চেষ্টা করা হয়। এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অতিদরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের এই অতিদরিদ্র কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন করা। আন্তর্জাতিক ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ এবং ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ যৌথভাবে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করে।

এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের প্রধান দিকসমূহ হচ্ছে:

- ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে যদিও অতিদরিদ্রের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে নাই, তথাপি খানাসমূহের কৃষি কাজের জন্য ভূমি ইজারা নেবার প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অতিদরিদ্র কর্মসূচির আওতাভুক্তদের গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগির মালিক হবার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির জোরালো প্রভাব থাকলেও এটা আর্শ্চয্যের বিষয় ছিল না, কেননা এই কর্মসূচির কার্যক্রম অনুসারে মূলত গরু, ছাগল ও মুরগি সুবিধাভোগীদের কাছে স্থানান্তর করা হয়।
- এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কারণে সুবিধাভোগীদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে।
- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী খানার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির কোন প্রভাব দেখা যায় নি। যদিও এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় কারণ কর্মসূচিতে শিক্ষার উপর প্রত্যক্ষ কোন সহায়তা নেই।
- অতিদরিদ্র কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের মধ্যে খাদ্য ঘাটতি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, তাদের খাদ্য নিরাপত্তা দৃশ্যত যথেষ্ট ভালো হয়েছে।
- এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কারণে অতিদরিদ্র খানাসমূহের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

অতিদরিদ্র খানাসমূহে বসবাসের পরিবেশ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা বেশ উন্নত হয়েছে।

- এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহে নতুন কাপড় ও জুতা ব্যবহারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেজলাইন জরিপ করা হয় ২০০২ সালে, এবং কর্মসূচির শেষ পর্যায়ে ২০০৪ সালেও কর্মসূচির দু'বছর পরে ২০০৬ সালে এই দুটি জরিপ করা হয়। উপ-নমুনা উপাত্ত ব্যবহার করে খানাসমূহের খাদ্য সংস্থানে অতিদরিদ্র কর্মসূচির কোন প্রভাব রয়েছে কী না তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়। উপ নমুনার উপর এই কর্মসূচির প্রভাব যদি আসলেই বিদ্যমান থাকে তবে খাদ্য সংস্থান টেকসই কী না সেটাও বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণার মূল্যায়নে এটা প্রতীয়মান হয় যে এই কর্মসূচির কারণে খানাসমূহের খাদ্য সংস্থান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসূচি শেষ হবার দু'বছর পরেও এ সংস্থান বিদ্যমান ছিল।

সংখ্যাবাচক মূল্যবিচারে খানাসমূহের উপর অতিদরিদ্র কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না সেভাবে। কর্মসূচির প্রভাব প্রতিটি খানার উপর সমানভাবে পড়েছে কী না অথবা কোন খানার উপর আদৌ কোন প্রভাব পড়ে নি এমনটা সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায় না। এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, সকল সুবিধাভোগী সমানভাবে উপকৃত হয় নি।

এই গবেষণায় পাঁচটি কেস স্টাডি উপস্থাপিত হয়েছে অতিদরিদ্র কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নে। এসব কেস স্ট্যাডির প্রত্যেকটিই সত্য ঘটনা যা কর্মসূচিভুক্তরা তাদের নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছে। কর্মসূচির শেষে ২০০৪ সালে একবার এবং এর চার বছর পর ২০০৮ সালে আবার এসব কেস স্টাডি সংগৃহীত হয়।

পুষ্পরানী ও কোহিনূর-এর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে কীভাবে তারা অতিদরিদ্র কর্মসূচির দ্বারা উপকৃত হয়েছে। চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, এবং কার্যকরী যোগাযোগের ক্ষমতা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার পুষ্পিতাকে তার প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক ব্যবহারে সহায়তা করেছে। ফলে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে সাহেরা ও শেফালী অতিদরিদ্র কর্মসূচির আওতায় সম্পদের অধিকারী হয়েও সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতার কারণে এ কর্মসূচির আশানুরূপ সুফল পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:৩৯-৪১

ব্র্যাক উগান্ডা গবেষণা ইউনিটের বিকাশ ও বিভিন্ন কার্যক্রম

প্রলয় বড়ুয়া*

- উগান্ডায় ব্র্যাক কাজ শুরু করেছে ২০০৬ সালে। আফ্রিকায় ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে গবেষণা সহায়তা দিতে ব্র্যাক উগান্ডা গবেষণা ইউনিট ২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করে।

সূচনা

ব্র্যাক উগান্ডার কার্যক্রম শুরু ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। আফ্রিকায় ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে গবেষণা সহায়তা দিতে ব্র্যাক উগান্ডা গবেষণা ইউনিট ২০০৮ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে যাত্রা শুরু করে। প্রথমদিকে নিয়মিত কর্মী ছিল তিন জন। বাংলাদেশ থেকে আমি প্রলয় বড়ুয়া এবং অপর দু'জন ছিলেন উগান্ডা ও ইথিওপিয়ার নাগরিক। প্রথমদিকে মনিটরিং ও গবেষণা ইউনিট একসাথে ছিল। তখন উগান্ডায় ব্র্যাকের ২০টি শাখা ছিল। কাজের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে বর্তমানে উগান্ডায় ব্র্যাকের ৯৪টি শাখা কাজ করছে। একই সঙ্গে সম্প্রসারিত হয়েছে ব্র্যাক উগান্ডা গবেষণা ইউনিট। আর মনিটরিং ইউনিট আত্মপ্রকাশ করেছে আলাদা ইউনিট হিসেবে। বর্তমানে ব্র্যাক উগান্ডা ইউনিটের আওতায় কাজ করছে সাতজন পূর্ণকালীন গবেষক, দু'জন ফিল্ড সুপারভাইজার, একজন ডাটা ম্যানেজার, একজন ডাটা কোডার এবং একজন ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর। এছাড়া রয়েছে মাঠ পর্যায়ের ১০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহকারীর একটি ডাটা বেইজ। উগান্ডা গবেষণা ইউনিটে বর্তমানে একটি উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট রয়েছে যেখানে আছে ১৬টি কম্পিউটার। দু'শিফটে এখানে কাজ করেন ৩২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর।

* প্রলয় বড়ুয়া, রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর, গবেষণা ও মূল্যায়ন ইউনিট, ব্র্যাক লাইবেরিয়া।

এই গবেষণা ইউনিটটি উগান্ডা ছাড়াও পূর্ব আফ্রিকার যেসব দেশে ব্র্যাকের কর্মসূচি রয়েছে (তাঞ্জানিয়া ও দক্ষিণ সুদান) সেখানেও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ত্বরান্বিত করতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা যেমন পিডিএ (পারসোন্যাল ডিজিটাল অ্যাসিসটেন্স) ও জিপিএস (জিওগ্রাফিক্যাল পজিশনিং সিস্টেম)- এর ব্যবহার এবং সহায়তাও নেয়া হচ্ছে। উগান্ডা গবেষণা ইউনিটের উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রটি নিজেদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাইরের কাজের জন্যও সেবা প্রদান করে থাকে।

রূপকল্প

ব্র্যাক উগান্ডা গবেষণা ইউনিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব আফ্রিকায় ব্র্যাক কর্মসূচির জন্য একটি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। ধীরে ধীরে জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করা। এই নলেজ সেন্টারটি হবে ব্যবহারিক গবেষণার একটি প্লাটফর্ম যেখান থেকে তুলনামূলক অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যাবে।

মিশন

ব্র্যাক গবেষণা ইউনিটের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য চারটি ধাপের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। প্রথম ধাপে সঠিকমানের উপাত্ত পাওয়া নিশ্চিত করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে একটি রিসার্চ অ্যাডভাইসরী গ্রুপ করা হবে যার কাজ হবে উপাত্তের মানসম্পন্ন আউপপুট বা কার্যাবলীর নির্দেশনা নিশ্চিত করা। তৃতীয় ধাপে তথ্য বিনিময়ের কাজ প্রাধান্য পাবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্র্যাক গবেষণা ইউনিটটি একটি লার্নিং সেন্টার হিসেবে রূপ লাভ করবে।

গবেষণা কার্যক্রম

বর্তমানে দু'ধরনের গবেষণা করা হয়- অপারেশনাল ও ইমপ্যাক্ট বা প্রভাব মূল্যায়নমূলক গবেষণা যা করা হয় মূলত খণ্ডকালীন ও দীর্ঘকালীন প্যানেল উপাত্তের ভিত্তিতে। শুরু থেকে এ যাবৎ মোট ২০টি অপারেশনাল গবেষণা এবং ১০টি প্রভাব মূল্যায়নমূলক গবেষণা হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথমটি তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য করা হয় এবং দ্বিতীয়টি প্রতিটি কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব জানার জন্য করা হয়। বছরের শুরুতে কর্মসূচির অংশগ্রহণে একটি ওয়ার্কশপ করা হয় এবং অপারেশনাল গবেষণার জন্য একটি বর্ষব্যাপী তালিকা

তৈরি করা হয়। প্রতি দু'মাসে ১-২টি অপারেশনাল গবেষণা করা হয়। অপরদিকে প্রভাব মূল্যায়নমূলক গবেষণাগুলো বেইজলাইন করার দু'বছরের মধ্যে ফলোআপ জরিপ করা হয়। প্রায় সব প্রভাব মূল্যায়নমূলক গবেষণার ক্ষেত্রেই আরসিটি (Randomized Control Trail) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আরসিটি পদ্ধতির ব্যবহার হয়েছে সাম্প্রাতিক সময়ের এমন একটি কাজের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল:

ব্র্যাক উগান্ডাতে ম্যালেরিয়ার হার কমানোর জন্য অতি সম্প্রতি ব্র্যাক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে একজন স্বেচ্ছাসেবীকে হ্যান্ড মাইক সরবরাহ করা হয়। সন্ধ্যায় এই সেচ্ছাসেবী সমাজের মানুষের কাছে একটি কথা মনে করিয়ে দেয়, 'সন্ধ্যায় মশারি টাঙাও' এবং মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানদান করে থাকে। ব্র্যাক গবেষণা ইউনিট এই প্রকল্পের মূল্যায়নের জন্য একটি বেইজলাইন জরিপ সম্পন্ন করেছে এবং ছয় থেকে আট মাস পরে একটি ফলোআপ জরিপও সম্পন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে ২৪ জন স্বেচ্ছাসেবীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে ১২ জনকে লটারির মাধ্যমে পছন্দ করে তাদের মধ্যে হ্যান্ড মাইক বিতরণ করা হয়। এই কমিউনিটিগুলোকে বলা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট এবং বাকি ১২টি কমিউনিটিকে কন্ট্রোল হিসেবে রাখা হয়েছে। এই গবেষণায় নমুনার আকার ছিল ১২০০টি খানা। প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবীর বাড়ির চারপাশ থেকে নিকটতম ৫০টি খানা জরিপ করা হয়েছে। এই বেইজলাইন জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ৬১% খানায় কমপক্ষে একটি মশারি রয়েছে। আবার ১৬% খানায় দু'টির বেশি মশারি দেখতে পাওয়া গেছে। বেইজলাইন জরিপে দেখা যায় ২৮% খানার সকল সদস্য মশারির নিচে ঘুমায়। অন্যদিকে যেসব খানায় মশারি রয়েছে তাদের ৩৫% মশারি ব্যবহার করে। গর্ভবতী মহিলাদের ৩১% মশারি ব্যবহার করে। দেখা গেছে যে, খানার ৫৪% সদস্য ম্যালেরিয়ায় ভোগে। অপরদিকে ৬৯% খানা সদস্য জানায় মশারির স্বল্পতাই মশারি ব্যবহার না করার প্রধান কারণ। যেসব খানায় মশারি রয়েছে তাদের ৬০% তা ক্রয় করেছে। গবেষণাধীন খানার ৪৭৫ জন মানুষ মশারির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জানে না। খানার ৫২% মানুষ রাতে ঘুমাতে যাবার আগে মশারি টাঙিয়ে থাকে।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:৪২-৪৪

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা উপজেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব*

শামীম হোসেন, মোঃ কামরুজ্জামান ও সৈয়দ মাসুদ আহমেদ

- একই অঞ্চলে বসবাস করলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত জ্ঞান বিভিন্ন রকম।
- ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ব্র্যাক দীঘিনালা অঞ্চলে কম খরচে মানসম্পন্ন রোগ নির্ণয় সুবিধা ও চিকিৎসা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়ায় ক্রমশই ব্র্যাকের ওপর স্থানীয় জনগণের আস্থা বাড়ছে।
- কীটনাশকযুক্ত মশারির ব্যবহার দীঘিনালা অঞ্চলের মানুষের কাছে একটি নতুন বিষয়। এখনও তারা সঠিকভাবে এর ব্যবহার প্রণালী শিখছে।

পটভূমি

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া একটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। এটি একটি মৌসুমী রোগ এবং এই রোগের প্রকোপ দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের তেরটি জেলায় খুব বেশি। দীর্ঘদিন ধরেই এই রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে এসব এলাকায়, বিশেষ করে পাহাড়ী এলাকায় নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও রীতি অনুয়ায়ী এরা ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে ম্যালেরিয়া কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যব্যবস্থাপক, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকাগণ স্থানীয় এসব ধ্যান-ধারণাকে তেমন একটা প্রাধান্য দেন না, ম্যালেরিয়া নিয়ে তাদের প্রচলিত জ্ঞান ও চর্চাকে বোঝারও কোন চেষ্টা করেন না।

*'Exploring explanatory model of malaria in hill tracts of Bangladesh: perspective from Dighinala *Upazila.*' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০১০)। সার-সংক্ষেপ করেছেন শামীম হোসেন।

ম্যালেরিয়া বিষয়ে স্থানীয় লোকজনের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, আচরণ, জ্ঞান ও চর্চাগুলোকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা উচিত কেননা এমনটা করা হলে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কর্মসূচির সফলতা অনেক বেশি হতে পারে, জনগণ এসব কর্মসূচির সাথে সহজেই একাত্ম হতে সক্ষম হবে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বেশি রয়েছে এমন একটি পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া বিষয়ক যেসব ধ্যান-ধারণা ও চর্চাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা। এই ধ্যান-ধারণা ও চর্চাসমূহকে একটি মডেল হিসেবে দেখা যাকে আমরা 'এক্সপ্ল্যানাটরি মডেল' (Explanatory model) নামে অভিহিত করতে পারি। 'এক্সপ্ল্যানাটরি মডেল' হলো এমন একটি ধারণা যার মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ রোগ, তার রুগী ও চিকিৎসকদের রোগ বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা, রোগ নির্ণয় প্রণালী, চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সুপারিশসহ সকল কিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই মডেল ভালভাবে বুঝে কর্মসূচি পরিচালিত করলে তা যেমন পরিচালনাকারীদের জন্য সহজ হয় অপর দিকে স্থানীয় মানুষের কাছেও তা গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে।

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে যেখানে তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের বাস – চাকমা, ত্রিপুরা ও বাঙালি। তাছাড়া উপজেলা অনুযায়ী হিসাব মতে এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দ্বিতীয় স্থানে (২২%)। গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রতিটি সম্প্রদায়ের নারী পুরুষদের সাথে ৩৬টি করে নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং ১২টি করে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশসমূহ

দেখা গেছে, একই অঞ্চলে বসবাস করলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা, রোগ নির্ণয় প্রণালী, চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সুপারিশসমূহ বিভিন্ন রকম। চিরাচরিতভাবে তারা ম্যালেরিয়া রোগের সাথে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত হলেও ম্যালেরিয়া রোগকে তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে চেনে। বেশিরভাগই এ রোগকে 'মারাত্মক', 'ক্ষতিকর' এবং 'জটিল রোগ' বলে অভিহিত করে। রোগের লক্ষণগুলো সম্পর্কে এ অঞ্চলের বাঙালি ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের চেয়ে চাকমা সম্প্রদায় বেশি জানে। উত্তরদাতাদের অধিকাংশ মনে

করেন মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগ হয় এবং এটি একটি মৌসুমী রোগ। তবে খুব কম সংখ্যক মানুষ জানে যে কীভাবে এ রোগ ছড়ায় যদিও সময়ের সাথে সাথে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। কম খরচে মানসম্পন্ন রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদানে ব্র্যাকের নিশ্চয়তা, ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্থানীয় জনগণের মাঝে বিদ্যমান সুসম্পর্কের কারণে ক্রমশই ব্র্যাকের উপর জনগণের আস্থা বাড়ছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা গেছে। কীটনাশকযুক্ত মশারির ব্যবহার তাদের কাছে একটি নতুন বিষয়। এখনও তারা এটির সঠিকভাবে ব্যবহার শিখছে। এ কর্মসূচির স্বাস্থ্যকর্মীদেরও এসব বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা উপকরণসমূহ নতুনভাবে সাজাতে হবে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সম্প্রদায়ের ম্যালেরিয়া বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কিছু বিষয়ে মিল পাওয়া গেলেও অনেক অমিলও লক্ষ্য করা গেছে। এসব সম্প্রদায়ের নিজস্ব আরও কিছু চর্চা রয়েছে যা পর্যবেক্ষণ করার মতো। এ কর্মসূচির স্বাস্থ্যকর্মীদেরও এসব বিষয় সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারলে তা ম্যালেরিয়া কর্মসূচির সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণে, এর সমাধানে এবং সঠিক কৌশল গ্রহণে সহায়ক হতে পারে।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:৪৫-৪৯

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কেন্দ্রগুলোতে সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্যতা ও যথোপযুক্ত ব্যবহার: বাংলাদেশ কেমন করছে?*

সৈয়দ মাসুদ আহমেদ ও কাজী শাফায়েতুল ইসলাম

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনায় সাধারণ রোগের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের ব্যবহার খুব সীমিত।
- একই ওষুধের বিক্রয় মূল্যের তারতম্য থাকায় (শতকরা ৫০০ গুণ বা বেশি) সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় সাধারণ রোগের জন্য এন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহার দেখা যায়।

উনিশ'শ বিরাশি সালের জাতীয় ওষুধ নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল যথার্থ মূল্যে গুণগত মান ঠিক রেখে জনগণের কাছে অত্যাবশকীয় ওষুধ পৌঁছে দেয়া। সেই সময়ে বাংলাদেশ সরকার ১৫০টি অত্যাবশকীয় ওষুধের তালিকা প্রকাশ করেন এবং ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। উদ্দেশ্য ছিল জনগণ যেন সহজেই তাদের ক্রয় সীমার মধ্যে ওষুধ ক্রয় করতে পারেন। পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে অত্যাবশকীয় ওষুধের মূল্য শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী বছরগুলিতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্ততা, দাম ও ব্যবহারে চরম অনিয়ম দেখা যায়। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ওষুধের প্রাপ্ততা কমে যেতে দেখা যায়, পাশাপাশি অত্যাবশকীয় ওষুধের ব্যবহার কমে গিয়ে অযথা দামি ওষুধের ব্যবহার বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে ওষুধের মূল্যের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়।

*'Availability, affordability and rational use of drugs in the PHC facilities following national drug policy of 1982: Is Bangladesh on right track?' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাজী শাফায়েতুল ইসলাম।

সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে সরকারি কেন্দ্রীয় ওষুধ ভাণ্ডার থেকে (Central Medical Store) ওষুধ সরবরাহ করা হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে প্রায় ৭০,০০০ লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকান আছে যেখানে ডাক্তারের পরামর্শপত্র (Prescription) ছাড়াই ওষুধ বিক্রয় হয়। এসব দোকানে যারা ওষুধের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত তাদের ওষুধের ব্যবহারের উপর কোন জ্ঞান নাই। লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকান ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে উঠা বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী অযথা ওষুধের ব্যবহার করতে যেমন উৎসাহিত করছে, তেমনি চড়া মূল্যে ওষুধ বিক্রয় করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে।

অপরদিকে সরকারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারও বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী এবং লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকানের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারছে না। ফলে মানসম্পন্ন নয় এমন ওষুধ বাজারে সহজেই ঢুকে পড়ছে। এক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহারের সময়সীমাও ঠিকভাবে বেঁধে দেওয়া হয় না।

১৯৮২ সালে প্রণীত জাতীয় ওষুধ নীতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। এই নীতির মূল কথা হচ্ছে ওষুধের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। ওষুধের যথাযথ মূল্য, তার প্রাপ্যতা এবং ব্যবহারের ওপর এই নীতি কী প্রভাব ফেলেছে তার ওপর সেরকম কোন গবেষণা হয় নি। প্রায় ১৫ বছর আগে খুব সীমিত আকারে সরকারি ব্যবস্থাপনায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের ওপর গবেষণা হয়েছিল। তাই এসকল বিষয় দেখার জন্য ২০০৯ সালে ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ আলোচ্য গবেষণাটি হাতে নেয়। এই গবেষণার ফলাফল থেকে ওষুধের সহজ প্রাপ্যতা, যথার্থ মূল্য বা ব্যবহার সম্পর্কে শহর বা পল্লী এলাকা ভেদে ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া, নীতি নির্ধারকরা গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে ভবিষ্যতে দরিদ্র জনগণের কাছে সহজেই যাতে ওষুধ পৌঁছানো যায় এবং তার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবেন।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি ৩০টি সরকারি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ঢাকা শহরের ২০টি নগর ক্লিনিকে পরিচালিত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৬টি বিভাগ থেকে সমানুপাতিক হারে নির্বাচন করা হয়। ঢাকা শহরের

১০টি এলাকা থেকে ২টি করে মোট ২০টি নগর ক্লিনিক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ১০টি এলাকা নগর প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রোজেক্ট-২ এর আওতাধীন।

প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও নগর ক্লিনিক থেকে ৩০ জন করে মোট ১৫০০ রোগী দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। এই সব রোগীরা সাধারণ রোগে* ভুগছিল। দুইটি পদ্ধতীতে: পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রোগীদের পর্যবেক্ষণে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষার সময়কাল, ডাক্তারের পরামর্শপত্র, ওষুধ সরবরাহের সময়কাল ইত্যাদি এবং রোগীর সাথে কথোপকথন এবং ওষুধের দোকান জরিপের মাধ্যমে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণায় সাধারণ রোগের উপর ভিত্তি করে অত্যাবশ্যকীয় ২০টি ওষুধের ১টি তালিকা (রেফারেন্স) তৈরি করা হয়। তালিকাটি তৈরি করার সময় কিছু বিশেষ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যেমন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাধারণ রোগের প্রকোপ, এবং সরকার অনুমোদিত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা।

ফলাফল

১. তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে দেখা যায় যে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তুলনায় নগর ক্লিনিকে ৫ বছরের নীচে অসুস্থ শিশুর সংখ্যা বেশি (২৭% বনাম ৪০%) আবার উভয় ব্যবস্থাপনায় মহিলা রোগীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি। বৃদ্ধ রোগীর সংখ্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দ্বিগুণেরও (৪% বনাম ৭.২%) বেশি।

২. উভয় ব্যবস্থাপনায় গবেষণার জন্য ব্যবহৃত সাধারণ রোগের জন্য যে ওষুধের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, সেই তালিকা অনুযায়ী ২০টি ওষুধ কোথাও নেই। শুধু মাত্র ১৫টি ওষুধ পাওয়া গেছে ২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (শতকরা ৬ ভাগ) এবং ৪টি নগর ক্লিনিকে (শতকরা ১৫ ভাগ)।

* সর্দি, কাশি, জ্বর, পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যাথা, আমাশা, শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা, গায়ে ব্যথা, গ্যাস্ট্রিক, কৃমি, চামড়ার ক্ষত।

৩. গড়ে প্রতিটি ডাক্তারের পরামর্শপত্রে ওষুধের সংখ্যা ছিল ২.২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং ২.৫টি নগর ক্লিনিকে। শতকরা ৪৬ ভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগী এবং শতকরা ৩৩ ভাগ নগর ক্লিনিকের রোগীর ব্যবস্থাপত্রে ৩টি বা তিনের অধিক ওষুধ দেওয়া হয়। শতকরা ৪৪ ভাগ রোগীর পরামর্শপত্রে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। শতকরা ৬০ ভাগের বেশি রোগীর ব্যবস্থাপত্রের ওষুধ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা থেকে দেওয়া হয়।
৪. ওষুধের দোকানে জরিপের মাধ্যমে জানা যায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বিভিন্ন কোম্পানী আরোপিত বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি করা হয়। বিশেষ করে আয়রন, ক্রিমিনাশক এবং চামড়ার ক্ষত ভালো করার ওষুধ। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব ওষুধ ৫ গুণ বা তার বেশি দাম রাখা হয়। ওষুধের দামের ভিন্নতার জন্য খুব গরীব রোগীর সাপ্তাহিক মোট আয়ের উপর বড় রকমের প্রভাব পড়ে।
৫. প্রতিটি রোগীর জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার ১-২ মিনিট ব্যয় করেন, এবং ২-৬ মিনিট ব্যয় করা হয় নগর ক্লিনিকগুলিতে। ৭৬ ভাগ ব্যবস্থাপত্রের ওষুধ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে সরবরাহ করা হয় তবে নগর ক্লিনিকে এর সংখ্যা অনেক কম (৪৪%)। উভয় ব্যবস্থাপনায় বেশিরভাগ ওষুধ মোড়ককৃত থাকে না। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শতকরা ৬৫ ভাগ ওষুধ এবং নগর ক্লিনিকের ৪৩ ভাগ ওষুধ মোড়ককৃত ছিল। তথাপি শতকরা ৭০ ভাগের বেশি রোগী ওষুধের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত বলে জানিয়েছে।
৬. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তুলনায় নগর ক্লিনিকে রোগীর গড় অপেক্ষার সময় বেশি (২৪ বনাম ১৭ মিনিট)। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪২ ভাগ রোগীর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ৩৪ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে শারীরিক গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে নগর ক্লিনিকের অবস্থা অনেক ভালো (যথাক্রমে ৭৬% ও ৬৬%)।
৭. যে কোন ব্যবস্থাপনায় বেশিরভাগ রোগীরা সেবা গ্রহণের পর খুশি হয়েছেন (৮৪-৮৫%)।

উপসংহার

জাতীয় ওষুধনীতি অনুসারে অত্যাবশকীয় ওষুধের প্রাপ্ততা, ওষুধের ক্রয় ক্ষমতা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব একটা অর্জন সম্ভব হয় নি। গত ১৫ বছরে অবস্থার

অবনতি হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সেবা প্রদানকারীকে জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা থেকে ওষুধ লিখতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং নিরুৎসাহিত করতে হবে অযথা এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে বা ব্যবস্থাপত্রে বেশি বেশি ওষুধ না লেখার জন্য। সরকারের ওষুধ প্রশাসনকে নিয়মিতভাবে অবলোকন করতে হবে যাতে মানসম্মত মানের ওষুধ বাজারে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

© BRAC
নির্যাস ২০১০ ডিসেম্বর;২১:৫০-৫২

দাঁত ও মুখের যত্ন সম্পর্কে পল্লী এলাকার জনগণের ধারণা: একটি পাইলট জরিপ*

অন্তরা মাহমুদ খান ও সৈয়দ মাসুদ আহমেদ

- জরিপের আওতাধীন এলাকায় মানুষের মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান ও এ সম্পর্কিত সচেতনতা খুব কম ছিল। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ উত্তরদাতাই মুখ ও দাঁতের সঠিক পরিচর্যার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নন। এমনকি সাধারণ স্বাস্থ্যগত অবস্থার সঙ্গে এর কী ধরনের বিরূপ সম্পর্ক রয়েছে তা তারা জানে না।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এসব মানুষ নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে অপেশাদার মানুষের কাছে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ নিতে যায়। বেশিরভাগ মানুষই রাস্তার ধারের দাঁতের তথাকথিত চিকিৎসকের কাছে যায় দাঁতের সমস্যার সমাধান খুঁজতে। বেদে বা কবিরাজ এক্ষেত্রে দাঁতের চিকিৎসায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
- জরিপে অংশ নেয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুখের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় অবহেলার মনোভাব দেখতে পাওয়া গেছে। তারা কদাচিৎ টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহার করে, এর পরিবর্তে তারা গাছের ডাল ব্যবাহার করে। দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য এগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার বরং মুখ ও দাঁতের জন্য বিভিন্ন ক্ষতির কারণ হয়।

*'Oral and dental health in Gauripur *upazila,* Bangladesh: findings from a pilot survey 2010' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০১০)। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা ও অন্তরা মাহমুদ খান।

পটভূমি

দাঁতে গর্ত থাকলে তা রোগ-জীবাণু দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয় যা আমাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। আমাদের দাঁত ও দাঁতের মাড়ি রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে খাবার চিবিয়ে খেতে বা গিলতে, কথা বলতে এবং ঘুমাতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে ৮০% মানুষ কোন না কোন ধরনের দাঁতের রোগে ভুগে থাকে। সাধারণ জনগণের ধারণা হচ্ছে দাঁতের চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল। আর এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাই তাদের দাঁতের চিকিৎসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে। তাই মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য বা যত্ন সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞান ও সচেতনতা কতটুকু তা জানার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সম্প্রতি গবেষণাটি করেছিল গাজীপুর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে। এ তিনটি ইউনিয়ন হচ্ছে ভাংগামারি, অচিন্ত্যপুর ও গৌরীপুর সদর।

গবেষণার ফলাফল

১. জরিপের আওতাধীন এলাকার মানুষের দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সচেতনতা খুব কম। বেশিরভাগ উত্তরদাতাই মুখ ও দাঁতের সঠিক পরিচর্যা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে না। এমনকি সাধারণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে এর কী ধরনের বিরূপ সম্পর্ক রয়েছে তাও তারা জানে না।

২. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা অপেশাদার লোকের কাছে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ নিতে গিয়ে নানাভাবে প্রতারিত হয়। দেখা যায়, বেশিরভাগ মানুষই রাস্তার ধারে বসা তথাকথিত দন্ত চিকিৎসকের কাছে যায় দাঁতের সমস্যার জন্যে। এক্ষেত্রে বেদে বা কবিরাজ দাঁতের চিকিৎসায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

৩. জরিপে অংশ নেয়া জনগোষ্ঠী মুখের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় অবহেলা করে। তাঁরা কদাচিৎ টুথব্রাশ, টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহার করে। এর পরিবর্তে তারা গাছের ডাল ব্যবহার করে। দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য এগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার বরং মুখ ও দাঁতের জন্য বিভিন্ন ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

৪. ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে এলাকার লোকদের দাঁতের গোড়ায় পাথর (Calculus), দাঁতে গর্ত সৃষ্টি (Dental caries), দাঁতের ঘর্ষণজনিত ক্ষয় (Attrition), মুখে দুর্গন্ধ (Halitosis) ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

উপসংহার

এই পাইলট গবেষণার মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট পল্লী এলাকার মানুষ মুখ ও দাঁতের সঠিক যত্ন ও চিকিৎসা নিতে পারছে কীনা সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। যা এ সম্পর্কিত স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হতে পারে।

সুপারিশসমূহ

১. আচরণগত পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জ্ঞান এবং মনোভাবের পরিবর্তন। তাই মুখ ও দাঁতের সঠিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে জনগোষ্ঠীকে এ ব্যাপারে সচেতন করা দরকার। এই সচেতনতা তাদের সঠিকভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করবে।

২. দেশে মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও রোগ প্রতিরোধে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে হবে, বিশেষভাবে যারা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী তারা সরাসরি এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। স্কুল স্বাস্থ্য কার্যক্রম মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. দেশে দন্ত চিকিৎসকের স্বল্পতার কারণে ব্র্যাক তার স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্যসেবিকাদের মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক ও প্রতিরোধমূলক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এতে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতার সৃষ্টি হবে। দাঁতের সমস্যা বিনা চিকিৎসায় রেখে দিলে কী হতে পারে, এবং পেশাদার ও অপেশাদার দন্ত চিকিৎসকের মধ্যে তফাৎ কোথায় সেটা তারা বুঝতে সক্ষম হবে। স্বাস্থ্যকর্মী বিভিন্ন খানা পরিদর্শনে গেলে মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ভাল চিকিৎসা সেবার জন্য সুপারিশ করতে পারে। এ বিষয়টি সেবিকারা উঠান বৈঠকের সময় তুলে ধরতে পারে।

নির্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ডে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ

খণ্ড ২০ জুন ২০১০

সম্পাদকীয়
সাম্প্রতিক খবর
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত প্রাথমিক স্তরের গণিত পাঠ্যপুস্তকসমূহের একটি পর্যালোচনা
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত বাংলা বইয়ে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা
গ্রামীণ বাংলাদেশে পয়ঃনিষ্কাশনে বন্যার প্রভাব: একটি মূল্যায়ন
মানবাধিকার এবং আইন-সম্পর্কিত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি
গ্রামীণ নারীদের বিচার পাবার পথ সুগম করতে ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি পরিচালিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রভাব
লাইবেরীয়া ও সিয়েরা লিওনে ব্র্যাকের গবেষণা কার্যক্রম
কাছে দেখতে সমস্যা হয় এমন রোগীদের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাকের চশমা প্রকল্প
গ্রাম বাংলায় যক্ষ্মার চিকিৎসা নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তিসমূহ
বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব: ২০০৭-এর বেইজলাইন জরিপ
অতি দরিদ্রদের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সিএফপিআর কর্মসূচির আওতাধীন প্যানেল চিকিৎসক স্কিমের একটি মূল্যায়ন।

খণ্ড ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯

সম্পাদকীয়
সাম্প্রতিক খবর
সরকারি ও ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন: একটি তুলনামূলক গবেষণা

কিশোর-কিশোরীদের জীবনমানের উন্নয়নে ব্র্যাকের কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব
ব্র্যাকের বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যকার ফলাফলের তারতম্যের কারণ অনুসন্ধান
যৌতুক দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কারণসমূহ
তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্র্যাকের অবদান: ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের নিয়ে একটি সমীক্ষা
জেন্ডারগত ভূমিকা এবং সম্পর্কের প্রতি গ্রামের মানুষের জানার পরিধি, ধারণা এবং মনোভাবের পরিবর্তনে ব্র্যাকের জিকিউএএল কর্মসূচির একটি মূল্যায়ন
গণ নাটক ও ব্র্যাক
ব্র্যাকের কর্মসূচিসমূহ পুনঃপরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবেশগত অবস্থার একটি মূল্যায়ন
বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের রূপান্তর: প্রেক্ষিত কবিরপন্থী পাইনকা চা শ্রমিক
উন্নতমানের স্যানিটেশন সেবা পাবার জন্য ব্যয় করার ইচ্ছা পোষণ এবং
ব্র্যাকের পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নগত প্রভাব নির্ধারণ
নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের বর্তমান অবস্থার একটি অনুসন্ধান
অতি দরিদ্রদের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সিএফপিআর কর্মসূচির আওতাধীন প্যানেল চিকিৎসক স্কিমের একটি মূল্যায়ন
যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গ্রাম ডাক্তারের ভূমিকা
মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নীলফামারীতে ব্র্যাকের গৃহীত পাইলট প্রকল্প: পরিবর্তনের রূপ রেখা

খণ্ড ১৮ জানুয়ারি ২০০৯

সম্পাদকীয়
ব্র্যাক আন্তর্জাতিক কর্মসূচি: এশিয়া ও আফ্রিকার গরীব মানুষকে সহায়তার জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার সৃজনশীল প্রয়াস
ব্র্যাক-আফ্রিকা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি
সুনামী আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন: ব্র্যাক শ্রীলংকার কর্মসূচি মূল্যায়ন

ব্র্যাক তানজানিয়ায় আবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি: বেইজলাইন জরিপ ২০০৭
আফগানিস্তানে ব্র্যাক পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের মৌলিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্নকারী ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার একটি চিত্র
আফগানিস্তানে স্বাস্থ্যখাতের উপর পরিচালিত গবেষণার বিভিন্ন দিক
পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডায় ব্র্যাকের কার্যক্রম ও কিছু অভিজ্ঞতা
আফগানিস্তান থেকে সিয়েরা লিওন - ব্র্যাক আন্তর্জাতিক কর্মসূচিভুক্ত দেশগুলোর পরিচিতি
আফগানিস্তান
শ্রীলংকা
পাকিস্তান
উগান্ডা
দক্ষিণ সুদান
তানজানিয়া
লাইবেরীয়া
সিয়েরা লিওন
ব্র্যাক লাইবেরীয়া
উগান্ডার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু চিত্র
আফগানিস্তানে ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: একটি মূল্যায়ন
পরিশিষ্ট: একনজরে ব্র্যাক আন্তর্জাতিক কর্মসূচি

খণ্ড ১৭ নভেম্বর ২০০৭

সম্পাদকীয়
বাংলাদেশের শাসন পরিস্থিতি ২০০৬
সরকারি স্বাস্থ্য সেবাখাতে নার্সিং পেশায় গভর্নেন্সের বেহাল অবস্থা
স্কুল ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা
আফ্রিকায় ব্র্যাক
শিশুশ্রম: কাজে নেয়ার জন্য মালিকদের নানা নতুন কৌশল
'নগর দরিদ্র' বস্তিবাসীর রাজনীতি ভাবনা

ওয়াশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে ব্র্যাক ও বাংলাদেশ সরকার: সম্পর্কের নানা দিক
মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত স্কুল গভর্নেন্স ও স্কুল পারদর্শিতা
সরকারি হাসপাতাল যেন আরেক বাংলাদেশ

খণ্ড ১৬ ডিসেম্বর ২০০৬

সম্পাদকীয়
সাম্প্রতিক খবর
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা: বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছে কি?
মাঠপর্যায়ে ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগুরুত্বসম্পন্ন আঞ্চলিক সমস্যাবলীর প্রভাব: ব্র্যাকের মাঠকর্মীদের মতামত
ক) নদীভাঙ্গন ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনে ব্র্যাক কার্যক্রম
খ) নারী ও শিশুপাচার
গ) মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার – প্রেক্ষাপট বরিশাল

আর্থ-সামাজিক
ব্র্যাকের অতি দরিদ্র কর্মসূচির মুরগি পালনের অভিজ্ঞতা: একটি পরিবেশগত মূল্যায়ন
অতি দরিদ্রদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড টেকসইকরণের নির্ণায়কসমূহ
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ব্র্যাক ব্যাংকের ঋণ প্রকল্প
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পারদর্শিতা নিরীক্ষণ
আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাক প্রাক-প্রাথমিক গ্রাজুয়েটদের মূল্যায়ন
বাংলাদেশের গোসম্পদ উন্নয়নে ব্র্যাকের কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির অবদান
জলবায়ুর পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ: বাংলাদেশের নির্বাচিত ব্যবসাখাতে এসব পরিবর্তন ও দূষণগত প্রভাব
নিরাপদ সড়ক সম্পর্কে ড্রাইভার ও পথচারীদের ধারণা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আচরণের উপর একটি পর্যালোচনা
বস্তিবাসীদের অভিজ্ঞতায় বস্তি উচ্ছেদ: একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ

স্বাস্থ্য বিষয়ক
শিশুর জন্মকালীন কম ওজনের উপর পরিচালিত জাতীয় জরিপ ২০০৩-২০০৪

গ্রামীণ সমাজে নবজাতকের জীবন নিরাপদ করার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা
বাংলাদেশে গরীব মানুষের উপযোগী স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রসঙ্গে
ব্র্যাকের স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প
গ্রামের বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা: একটি মূল্যায়ন
রক্তের হিমোগ্লোবিন, আয়রন, ভিটামিন এ এবং শারীরিক বর্ধন ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট মিশ্রিত শরবতের কার্যকারীতা পরীক্ষা

খণ্ড ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫

সম্পাদকীয়
ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের ওয়েবসাইট উদ্বোধন
উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার কৌশল খুঁজতে আন্তর্জাতিক মতবিনিময় সভা ও জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশে শিশু ইনজুরির সামগ্রিক অবস্থা: প্রতিরোধের জন্য এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে

আর্থ-সামাজিক

পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর প্রতি সহিংসতা: একটি মূল্যায়ন
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও অঞ্চলগত অসমতার প্রেক্ষাপটে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ
অতি দরিদ্র সদস্যদের সবজি বিপণন এবং এর দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব
কিশোরীদের উন্নয়নে কিশোরীরা: আপন কোর্সের পাইলট মূল্যায়ন
কিশোরী সুপারভাইজারদের জীবনমানের পরিবর্তনে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব
ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল গ্রাজুয়েটদের মৌলিক যোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে
সমতার ভিত্তিতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা
ব্র্যাক নার্সারীতে উৎপাদিত আম্রপালি, লেবু ও পেয়ারার চারার উপর একটি সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

জেন্ডার ও যক্ষ্মা: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জেন্ডার সংবেদনশীল একটি কর্মসূচির মূল্যায়ন

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ এলাকায় রক্তস্বল্পতার ব্যাপকতার উপর পরিচালিত জরিপ - ২০০৩

প্রবীণদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প শীর্ষক বেইসলাইন জরিপ ২০০৩ এর ফলাফল

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমতা অবলোকন: বাংলাদেশ হেলথ ইক্যুইটি ওয়াচ (বিএইচইডব্লিউ): জরিপ - ২০০২

বাংলাদেশের কতিপয় নির্বাচিত এনজিও'র স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর পরিচালিত একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষা

বাংলাদেশে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার প্রভাব

বাংলাদেশে অতি দরিদ্রদের মধ্যে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার চিত্র

বাংলাদেশে ঔষধি উদ্ভিদ চাষের সম্ভাবনা: নাটোরের অভিজ্ঞতা